জসীমউদ্দীন মণ্ডল

জীবনের রেলগাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

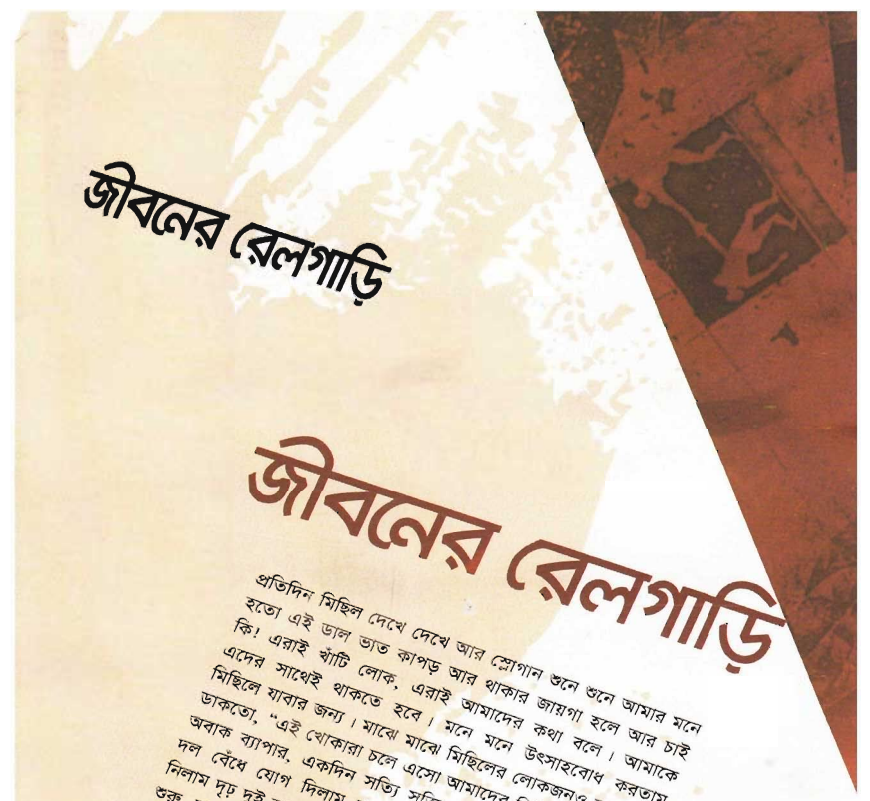

জীবনের রেলগাড়ি

জীবনের রেলগাড়ি

প্রতিদিন মিছিল দেখে দেখে আর শ্লোগান শুনে শুনে আমার মনে হতো এই ডাল ভাত কাপড় আর থাকার জায়গা হলে আর চাই কি! এরাই খাঁটি লোক, এরাই আমাদের কথা বলে। আমাকে এদের সাথেই থাকতে হবে। মনে মনে উৎসাহবোধ করতাম মিছিলে যাবার জন্য। মাঝে মাঝে মিছিলের লোকজনও আমাদের ডাকতো, "এই খোকারা চলে এসো আমাদের মিছিলে।" আর কী অবাক ব্যাপার, একদিন সত্যি সত্যি সম্মোহিতের মতো আমরা দল বেঁধে যোগ দিলাম লাল ঝন্ডার মিছিলে। প্রাকার্ড তুলে নিলাম দৃঢ় দুই হাতে। উঁচিয়ে ধরলাম লাল ঝাণ্ডা। তারপর থেকে শুরু হলো নিয়মিত মিছিলে যোগ দেয়ার পালা। মনে মনে নিজেকে কল্পনা করতাম লাল ঝাণ্ডার একজন বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে। মিছিল ছুটতো ধর্মতলা আর বউ বাজার ঘুরে মনুমেন্টের দিকে। মাঝে মাঝে থেমে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন শ্রমিক নেতারা। সেসব বক্তৃতার কী তেজ! বুকের গভীরে ঢুকে রক্তে মাতম লাগিয়ে দিতো। প্রতিদিন মিছিলে যোগ দেয়ার পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো। ইংরেজ বিরোধী মনোভাব আমার মধ্যে জেগেছিলো সেই ছোটবেলা থেকে, যখন কুঠিয়াল ইংরেজদের অত্যাচারের কথা শুনেছিলাম। সেই ইংরেজের প্রতি আমার ক্ষোভ মেটাতেই তখন আমি মিছিলে যেতাম। ভাবতাম, মিছিলে দাঁড়িয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য অনায়াসে ইংরেজকে গাল দেয়া যায়। সমস্ত ভয়, সমস্ত সঙ্কোচ ধুয়েমুছে যায় এই মিছিলে দাঁড়ালে। এই তো জীবন! এই তো আমার আজীবনের প্রত্যাশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের রেলগাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামী স্মৃতিকথা

জীবনের রেলগাড়ি

জসীমউদ্দীন মণ্ডল

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের রেলগাড়ি
জসীমউদ্দিন মণ্ডল

প্রকাশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২, কমরেড মণি সিংহ সড়ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রথম জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি, ২০১২

প্রচ্ছদ : মেহেদী বানু মিতা

অক্ষর বিন্যাস : মারুফ বিল্লাহ তন্ময়

মুদ্রণ : চিত্রকল্প, ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা

আইসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৮৬৭৫-৩০-৪

মূল্য : ১০০ টাকা

Jiboner Relgari, Autobiography of Josimuddin Mandol Published By jatio Sahitto Prokashoni, February 2012

Price : Taka 100
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডের

বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

জীবনভর শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে এসেছি। তাদের বাঁচার সংগ্রামে অংশ নিয়েছি। আর লড়াই করেছি অধিকার আদায়ের জন্য। হাতুড়ি-পেটা একজন শ্রমিক হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের তাগিদ মন থেকেই অনুভব করেছিলাম একদিন।

বৃটিশ শাসনামলেই আমার শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি, 'লাল ঝাণ্ডার' মিছিলে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতো সংগ্রাম, কতো আন্দোলন দেখলাম এ চোখেই! সেসব অভিজ্ঞতার কথা যে একদিন লিখে রাখবো, এ কথা ভাবি নি কখনো। তাই স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছি মাঝে মাঝেই। পাঠক যদি আমার এই রচনায় ইতিহাসের কালানুক্রম খুঁজতে যান, তাহলে হতাশ হবেন। এটা নিছক আমার জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতিময় কিছু ঘটনা বর্ণনা করবার অক্ষম প্রয়াস মাত্র।

আমার স্মৃতি জুড়ে আছে কেবল আন্দোলন, সংগ্রাম আর কারাগারের অন্ধকারময় জীবনের কথা। আছে বৃটিশ আর পাক শাসকদের নিপীড়নের ছবি। সেই সব পীড়নের ব্যথা এতদিন আমার অনুভবের মর্মেই গাঁথা ছিল। লিখে রাখবার মতো ভাষা আমার আয়ত্তে ছিল না। তাই ঘটনার যোগে অনুজপ্রতিম মফিদুল হক যখন আমার স্মৃতিকথা লিখবার তাগিদ দিয়ে বসলেন, তখন কেনো জানি না, না করতে পারিনি। মনের সংগোপনে একটা তাড়না অনুভব করেছিলাম ধীরে ধীরে। আবার ভয়ও পেয়েছিলাম এই ভেবে, আমার তো কেবল জানা আছে শ্রমিকের ভাষা। সে ভাষায় আর যাই হোক স্মৃতিকথা লেখা চলে না। কিন্তু বিপদ ত্রাণে এগিয়ে এলো স্নেহপ্রতিম আবুল কালাম আজাদ। ওরই সুপ্রযত্নে শেষতক আমার বলে যাওয়া কথাগুলো সুললিত ভাষায় অনুলিখিত হলো। স্বীকার করতেই হবে আমার কর্মব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় কেড়ে নিয়ে যে স্মৃতিকথা দাঁড়ালো সেটা একার্থে কালামেরই কৃতিত্বময় সৃষ্টি। এই পাণ্ডুলিপি ছাপার যোগ্য করে তোলার পেছনে আর একজনের পরিশ্রম কাজ করেছে, তিনি শিশু সাহিত্যিক আখতার হুসেন। এঁরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে পাঠক যদি কণামাত্রও আনন্দ পান, তবে সেটা হবে আমার সবচাইতে বড় প্রাপ্তি।

জসীমউদ্দিন মন্ডল
ঈশ্বরদী, পাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে আমার ছেলেবেলার দিনগুলো

আমার জন্ম হয়েছিলো এমন একটা পরিবারে, যেখানে জন্ম তারিখ কিংবা জন্মসন ঘটা করে লিখে রাখবার কোনো রেওয়াজ ছিলো না। সে সময় হিন্দু পরিবারে যেমন কুষ্টি ঠিকুজি রাখার ব্যবস্থা ছিলো, আমাদের তেমনটি ছিলো না। কাজেই আমার জন্ম কখন, কবে, কতো তারিখে হয়েছিল, সে কথা আজ আর মনে নেই। তবে ছোটবেলায় মা'র মুখে আমার জন্মসনটার কথা শুনতাম মাঝেমধ্যে। সেটাও মা বলতেন সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। মা বলতেন, 'সেই যে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধ শুরু হলো, তার ঠিক দশ বছর পর তোর জন্ম।' তার থেকেই আন্দাজ করতে পারি, ১৯১৪ সাল থেকে দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে এই পৃথিবীর আলোর মুখ আমি দেখি। আজকের কুষ্টিয়া জেলা তখন অবিভক্ত ভারতের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই নদীয়া জেলারই কালীদাশপুর গ্রাম আমার জন্মস্থান। আমার বাবার নাম হাউসউদ্দীন মণ্ডল। ছোটবেলায় দাদীর মুখে শূনেছিলাম, তিনি আদর করে তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন হাউস অর্থাৎ শখ। জানি না আমার বাবা সেদিন হাউস নাম গ্রহণ করে দাদীর শখ পূরণ করতে পেরেছিলেন কিনা।

বাবা রেলওয়েতে মাসিক তেরো টাকা বেতনে চাকরি করতেন। তাঁর ওই বেতনেই আমাদের সংসার কোনোমতে চলে যেতো। সব জিনিসই তো তখন সস্তা। মাত্র একটাকা দু'আনাতে বাজারের সেরা একমণ চাল পাওয়া যেতো। আট আনা নিয়ে বাজারে গেলে ধামা ভর্তি করে তরিতরকারি আর আনাজপাতি কিনে আনা যেতো। তাই সংসারে তেমন টানাপোড়েন ছিলো না।

যে সময়ের কথা বলছি, সেই তখন বাবার পোস্টিং ছিলো শিলিগুড়িতে। আমার তখন কতোই বা বয়স! তবুও সে সময়ের কথা ভাসা ভাসা মনে করতে পারি। আমাদের বাসা ছিলো ঠিক রেল স্টেশনের পাশেই। জানালা খুলে তাকালেই বহুদূর পর্যন্ত রেললাইন দেখা যেতো। দুপুরের খরো রোদে যখন রেলের লাইন মড়ার মতো পড়ে থাকতো, তখন মনে হতো, বিশাল দুটো অজগর যেন পাশাপাশি শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। মনটা কেন জানি তখন বিষন্ন হয়ে উঠতো। আবার যখন সেই লাইনের ওপর দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদে বহুদূর থেকে লম্বা চোঙঅলা ইঞ্জিনের সঙ্গে বাধাপড়া রেলের গাড়ি গলগলিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে ঝক্ ঝক্ শব্দে কু-উ শিটি বাজিয়ে ছুটে আসতো, তখন এই মন ভরে উঠতো মুহূর্তে এক অনাবিল আনন্দে। ছোট ছোট বগিঅলা সেই দার্জিলিং এর গাড়ি যখন শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে থামতো, তখন কতো রঙ বেরঙের লোক যে নামতো তার কামরা থেকে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। আমার সবচাইতে বেশি নজর কাড়তো গোরা সাহেবদের বাচ্চা-কাচ্চাগুলো। ঠিক যেন পরীর বাচ্চা এক একটা। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে যখন আমার ময়লা ফতুয়া আর ছেড়া ইজার প্যান্টের সাথে ওদের পোশাকের তুলনা করতাম, তখন লজ্জায় মাথা কেটে যাবার যোগাড় হতো। ভাবতাম, পাকা কমলার মতো টসটসে গায়ের রঙ ব্যাটারা পায় কোত্থেকে? দাদী বলতেন, ওরা রাজার জাত, তাই ওদের অমন গায়ের রঙ।

সে-সময় আজকের দিনের মতো অতোশতো স্কুল-ফিস্কুল হয়নি। গ্রাম দেশে তো প্রায় ছিলো না বললেই চলে। দু'একটা মক্তব, পাঠশালা যাও-বা ছিলো, সেগুলোরও প্রায় টিম টিমে অবস্থা। তো নানাবাড়ির গ্রামের এমনি একটা পাঠশালায় শুরু হলো আমার বিদ্যা অর্জনের কসরত। তবে বিদ্যা অর্জনের চাইতে বিদ্যা বিসর্জনের আয়োজনই ছিলো সেখানে বেশি। পাঠশালার পণ্ডিত মশাই আমাদেরকে সেদিনকার মতো পাঠ ধরিয়ে দিয়ে নড়বড়ে টেবিলে খ্যাংরা কাঠির মতে পা দু'খানা তুলে আয়েশ করে সটান হতেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই শুরু হতো তার নাকের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর গর্জন। আমরাও সেই অবসরে পিঠটান দিতাম আমবাগান মুখো। কতোবার যে আম পাড়াতে গিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের বকুনি খেয়েছি, তার শুমার নেই।

আমাদের পাঠশালাটি ছিল খড়ের চালা আর বাঁশের বাতা দিয়ে বেড়া দেয়া। আর তাতে সার সার বাঁশের মাচা খাড়া করে বসবার ব্যবস্থা। এক একদিন আমার ঘাড়ে ভূত চাপতো। দুষ্টুমি করে ক্লাসের মেয়েদের বেণি বেঁধে রাখতাম বেড়ার বাতায়। মেয়েরা চেঁচামেচি শুরু করলে পণ্ডিত মশাই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে শুরু করতেন গালিগালাজ। মনে পড়ে, পণ্ডিত মশাই আমাদের নেড়ে বলে গাল দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। 'ম্লে-চ্ছ', 'বর্বর' এগুলো ছিলো আরও একধাপ উচু পর্যায়ের গাল। তবে পাঠশালার হেড পণ্ডিতের কাছে কিন্তু আমি ছিলাম অসম্ভব সুবোধ বালক। কারণ, যেভাবেই হোক না কেনো, তার ক্লাশে আমি খুব বেশি একটা ফাঁকি দিতাম না। আমার মামার সঙ্গে আবার হেডপণ্ডিত মহিম মুখুজ্জের ছিলো ভীষণ রকমের দহরম-মহরম। প্রায়ই মহিম বাবু আমাদের বাড়িতে আসতেন। এসে কলাটা মুলোটা 'ভেট' নিয়ে যেতেন। মামাকে ডেকে আনন্দ বিগলিত গলায় বলতেন, 'বুঝলে হে, ছেলেটা কালে একজন কেউকেটা গোছের কিছু হবে, আমি বলে দিলুম।'

মহিম বাবুর বলা সেই কথাগুলো আজও কখনো মনে পড়লে ভাবি, কই, বাস্তবেতো ফললো না তাঁর কথা! তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর মতে, কেউকেটা আর হতে পারলাম কোথায়? বৃটিশ আমলের জসীম, পাকিস্তান পার করে বাংলাদেশে এসেও জসীম মণ্ডলই রয়ে গেলো। তখনো বাবাকে দেখতাম, মাস শেষে বেতনের সমস্ত টাকা দিয়ে ঋণকর্জ শোধ করে এসে মাকে বোঝাতেন এই বলে, "এবার আর হলো না গো, দেখো, সামনের মাসে তোমাকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার মতো করে আজও আমি আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে চলেছি, "সামনের মাসে দেখে নিও, একটা ভাল শাড়ি কিনে দেবো তোমাকে।" জসীম মণ্ডলের সেই সামনের মাস আর কোনোদিনই এলো না।

১৯৩২-এর দিকে বাবার একধাপ পদোন্নতি হলো আর সেই সাথে বদলিও। রেলের টালি ক্লার্কের পদ নিয়ে বাবা এলেন সিরাজগঞ্জে। সিরাজগঞ্জ ঘাটে তাঁকে কাজ করতে হতো বলে তার কাছাকাছিই ছিলো আমাদের বাসা। আমি মাঝে মধ্যেই একপা-দু'পা করে ঘাটে এসে উপস্থিত হতাম। ঘাটের কুলি কামিনদের হাঁকডাক, যাত্রীদের ওঠানামা দেখতে আমার খুব ভাল লাগতো। সবচাইতে বেশি মন কাড়তো আমার ভোঁ দেয়া স্টিমার। তখন আসাম বেঙ্গল রেলের স্টিমার সিরাজগঞ্জ ঘাট হয়ে যাতায়াত করতো। স্টিমার যখন ঘাট ছেড়ে গম্ভীর স্বরে ভোঁ বাজিয়ে দূর-দূরান্তরে পাড়ি জমাতো, তখন আমার মনও ছুটতো স্টিমারের সাথে সাথে। স্টিমারের গরুগাড়ির চাকার মত বিশাল চাকাটি যখন গুমগুম শব্দে পানি কেটে কেটে এগিয়ে যেতো, তখন সেই দৃশ্য দেখতে কী যে ভালো লাগতো আমার, সে কথা বলে বোঝাবার নয়। একদিন তো স্টিমার দেখতে দেখতে আমি প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিলাম। সে ঘটনা বলি। বাবার এক সহকর্মী আদর করে একদিন নদীর ধারে একটা টুলের ওপর আমাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "এইখানে বসে বসে মজা করে স্টিমার দেখো, কোথাও যাবে না কিন্তু খোকা।" আমি তো মহাখুশি। স্টিমার দেখছি আর ছড়া কাটছি–

স্টিমারের লাও, কল ঘুরিয়ে যাও।
এ-পাড়ার বৌগুলো তুলে নিয়ে যাও।

কিন্তু স্টিমার তো থেমে নেই, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আর তাই দেখে আমার মনও আর বসে থাকতে চাইল না স্থির হয়ে। কখন কোন ফাকে সম্মোহিতের মতো নদীর তীর ধরে ছড়া কাটতে কাটতে ছুটতে শুরু করেছি! নিজেই জানিনা কোথায় যাচ্ছি। অবশেষে রায় বাজার জুট মিলের কাছে এসে হুঁশ হলো ঘাট থেকে আমি যে অনেকটা পথ চলে এসেছি। সে সময় রায় বাজার জুট মিলের কাছেই ছিলো বিরাট এক আমবাগান। আম পাকার সময় তখন। একটুখানি এগিয়ে গিয়ে দেখি কি বাগানের লোকজন পাকা আম পাড়ছে মনের খুশিতে। তাই দেখে আমি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম। আর হাঁ করে চেয়ে রইলাম পাকা আমের দিকে। এমনি সময় বুড়ো মতো একজন এগিয়ে এলেন আমার কাছে। আমার অমন তাকিয়ে থাকা দেখে বোধহয় তাঁর মায়া হলো। বললেন, "আম খাবে খোকা?" আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম, 'হু'। আমাকে বেশ কটি পাকা আম দিলেন বুড়ো। মনে তখন খুশির তোলপাড়! কিন্তু আম নিই কিসে? শেষ পর্যন্ত বুড়োই আমার গায়ের জামাটা খুলে আমগুলো পুটলি বেঁধে দিলেন। আমি আমের পুটলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে এলাম। এইভাবে কিছুদুর আসতেই হঠাৎ করে আমার হুঁশ হলো। এতোক্ষণে বাবার কথা, বাসার কথা মনে হলো। এ কী, আমিতো পথ হারিয়ে ফেলেছি, ঘাটে যাবার পথটাতো চিনতে পারছি না। এখন কী হবে আমার? মনের মধ্যে ভয় ধরে গেলো। কেন জানি মনে হতে লাগলো হয়তো পথ চিনে আর কোনো দিনও বাসায় ফিরতে পারবো না। এভাবে চিন্তা করতে করতে কখন যে কালীবাড়ির পুলের কাছে এসে পড়েছি, খেয়ালই ছিলো না। তখন কালীবাড়ির পুলটা ছিলো কাঠের। তো, আমি পুলের ওপর উঠেই দিশেহারার মতো কান্না জুড়ে দিলাম। মা'র কথা বড় বেশি মনে পড়তে লাগলো।

কতো লোক আসছে যাচ্ছে, কাউকেই আমি চিনি না। আমার কান্না দেখে একে একে অনেকেই ভিড় করলো চারিদিকে। নানানজন নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। কোনো জবাব না দিয়ে আমি শুধু কেঁদেই চলেছি। এই অবস্থায় হঠাৎ দেখি লোকজন একটু ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল কেটে পড়ার জন্য। কারণ, ভিড় দেখে এরি মধ্যে এক লালপাগড়ি (বৃটিশ পুলিশ) এসে হাজির। জীবনে সেই প্রথম পুলিশ দেখা। দাদীর মুখে আগে দারোগা-পুলিশের গল্প শুনেছি। তাঁরা নাকি এক একটা আস্ত বাঘ। রাজার পুলিশ মানেই বিরাট তার প্রতিপত্তি! তখনকার দিনে কেউ পুলিশে চাকরি পেলে দশ গাঁ ভেঙে তাকে দেখতে আসতো। সেই পুলিশকে আজ আমি নিজের চোখে দেখছি এবং চোখের সামনে, কম কথা নয়? আমার মনের ভেতরে একটা ভয় মেশানো আনন্দ খেলা করতে লাগলো। বৃটিশের পুলিশ। তাঁর সে কী দাপট। তারপর আছে তার পোশাকের জেল্লাই। দু'পায়ে ইয়া বড়ো বুট। তার ওপর আবার হাঁটু পর্যন্ত মোজার মত করে পেঁচিয়ে বাঁধা ফোট। পরনে ঢলঢলে হাফপ্যান্ট, কোমরে পেতলের তক্‌মাঅলা চামড়ার বেল্ট। আর মাথায় লাল রঙের পাগড়ি (এ পাগড়ির কারণেই বৃটিশ পুলিশকে তখন লোকে লালপাগড়ি বলে ডাকত)। যা হোক পুলিশ বাবাজিতো এসেই হেঁড়ে গলায় হম্বিতম্বি জুড়ে দিলেন, 'কৌন হো ইয়ে লেড়কা? কাঁহাসে আয়া?" তার সেই হাঁকডাকেতো লোকজন একেবারে তটস্থ। তাই তারা এক এক করে সটকে পড়তে লাগলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া হবে আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নিয়ে। থানার কথা শুনে তো আমার আত্মারাম একেবারে খাঁচাছাড়া। এমনিতেই দাদীর মুখে লাল পাগড়িদের সম্পর্কে যেসব গল্প শুনেছি, তাতে করে তাদেরকে রাক্ষস-খোক্কস ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। তার ওপর আবার থানা! সেতো একটা রাক্ষসপুরী! কিন্তু বাস্তবে ঘটলো তার উল্টোটা। লাল পাগড়ি আমাকে যথেস্ট সমাদর করে হাতটাত ধরে নিয়ে গেলেন থানায়। সেখানে গিয়ে আমার কল্পনার সেই রাক্ষস আমাকে আদর করে বিস্কুট কিনে এনে খাওয়ালেন। আর মাটির ভাঁড়ে করে এনে দিলেন চা-ও। আমার মনের ভেতর তখন খুশির ঝড়। তাই চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলাম। এর আগে অবশ্য তিনি নানাভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার কান্না থামিয়েছিলেন। তাই ভাবি, আজকের দিনের পুলিশ হলে, আমার মত বাচ্চা ছেলেকেও নির্ঘাৎ পকেটমার ঠাউরে বাবার কাছ থেকে টু-পাইস কামাবার অবশ্যই চেষ্টা করতেন।

এদিকে হয়েছে কি, আমার খোঁজে ততোক্ষণে ঘাট জুড়ে বেধে গেছে একটা মহা হুলস্থুল কাণ্ড। বাবাতো আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে আতিপাতি খুঁজতে খুঁজতে মামা এসে হাজির হলেন থানায়। পুলিশ বাবাজির অনেক গাল-মন্দ হজম করে মামা সেদিন আমাকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন।

আমার দাদাবাড়ি ছিলো নদীয়া। নদীয়া জেলারই হৃদয়রাম গ্রামে। ছেলেবেলায় সেই গ্রামে গরু চরাতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কতো দিন নীলকুঠির ভাঙাচোরা দালানের কাছাকাছি হাজির হয়েছি। ওখানে কোনো গাছের ছায়ায় বসে বসে গ্রামের বয়েসী লোকজনদের কাছ থেকে শুনতাম কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী। নীল জিনিসটা যে কি, সেটা তখনো বুঝতাম না। তবে কুঠিয়াল সাহেবরা যে নীল চাষের জন্য চাষাভুষো মানুষদের ওপর অত্যাচার করতো, সেটা আমার কাছে ওই বয়সেই অন্যায় কাজ বলে মনে হতো। সাহেবদের ওপর সে কারণে বিতৃষ্ণা জন্মেছিলো আমার মনে সেই তখন থেকেই।

আশ্বিন মাস এলেই পুজোর ছুটি হতো। হিন্দুদের ভেতরে দুর্গাপুজোর ধুম পড়ে যেতো। মুসলমানরাও সেই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতো নির্দ্বিধায়। পুজোর ছুটিতে আমরা মায়ের সাথে মামার বাড়িতেও বেড়াতে যেতাম। মামা বাড়ি গিয়ে আমার প্রথম কাজ হতো চিৎলার ঘাটে দুর্গাপুজোর আড়ং দেখতে যাওয়া। মামার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আড়ং-এ যেতাম। পথে পড়তো আমলার জমিদারদের বিশাল প্রাসাদ। সঙ্গী-সাথীরা বলতো, "রাজার বাড়ি, ও বাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকাতে নেই।" তাই রাজবাড়ির সামনে দিয়ে ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করে যেতো হতো। আমার মন কিন্তু কিছুতেই এ নিষেধ মানতে চাইতো না। এক ফাঁকে টুক করে লুকিয়ে দেখে নিতাম রাজবাড়ী। কী বিরাট সেই প্রাসাদ! ভাবতাম, ওখানে যারা থাকে, তারা না জানি দেখতে কেমন! ওরা কি আমাদেরই মতো মানুষ, না অন্যরকম কিছু? আমার বড় শখ হতো জমিদার বাড়ির মানুষগুলোকে এক নজর দেখতে। যেতে যেতে মামা গল্প বলতেন জমিদারদের। আমলার জমিদারদের নাকি এক কন্যা ছিলো। নাম তার পিয়ারী সুন্দরী। সোনার মত বরণ ছিলো তার। আর দেখতে নাকি পরমা সুন্দরী। সেই কন্যাকে একবার জোর করে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলেন এক গোরা সাহেব। নাম রেনউইক। জমিদার দিশেহারা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লেন। কিন্তু তার লাঠিয়ালদের সরদার ছিলো দেলশাদ নামের এক জবরদস্ত পালোয়ান। সে ব্যাপারটা দেখে হেঁকে বললো, "জান থাকতে পিয়ারী সুন্দরীকে নিয়ে যেতে দেবো না। আসুক গোরাদের কতো সেপাই আছে!" হলোও তাই। দেলশাদ আর তার লাঠিয়াল বাহিনী পিটিয়ে একসা করেছিলো সেদিন গোরা সাহেবের বরকন্দাজদের। তারপর আর কোনোদিনও এই গোরা সাহেব আর আমলা মুখো হননি (কুষ্টিয়া শহরে এখনো রেনউইকের নামে একটি রাস্তা ও 'যজ্ঞেশ্বর রেনউইক ইন্ডাস্টি' রেনউইক সাহেবের স্মৃতি বহন করে আছে)।

আমলার জমিদারদের শান-শওকত দেখে গরিব আর বড়লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মাঝে মাঝেই আমার মনে প্রশ্ন জাগতো, ওদের আছে, আমাদের নেই কেনো? গরিব আর বড়লোকের প্রভেদ সম্পর্কে তখন থেকেই মোটামুটি আমার মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিলো।

চিৎলার ঘাটের পুজোমন্ডপের সামনে বসত বিশাল মেলা। আমরা বলতাম আড়ং। সে মেলায় কতো না জিনিস পাওয়া যেতো। চিনির ছাঁচ, ভুটার খৈ, খাগড়াই, খুরমা, কদমা আর বাতাসাসহ এ ধরনের আরো কতো মিষ্টি। সেই সাথে হরেক রকমের খেলনাও। টিনের বাঁশি, সোলার কদম ফুল, সোলার পাখি আর গোয়ালনী পুতুল আরো কতো কী! আজ আর সেসব জিনিস বড় একটা চোখে পড়ে না। চরকির মতো নাগর দোলা বসানো হতো, মেলার ঠিক মাঝ বরাবর। একপয়সা দিলে কয়েক চক্কর ঘুরে আসা যেতো। একপাশে তাঁবু খাটিয়ে বসতো সার্কাস আর যাত্রা। বসতো কবিগানের আসর। ডুগডুগি বাজিয়ে একটানা ছড়া কেটে, মক্কা-মদিনার ছবি দেখাতো 'মক্কা-মদিনাঅলা'। সে এক আজব জিনিস। একটা বড় টিনের বাকসের সাথে সারি সারি চোঙে আতস কাচ বসানো। সেই চোঙে চোখ লাগালে হরেক রকম ছবি দেখা যেতো। আর সেই সাথে ছড়া কেটে ছবির বর্ণনা–

তারপরেতে দেখেন ভালো
গান্ধী রাজার মেয়ে ছিলো,
সাড়ে সাত মণ ওজন ছিলো....।

শীত পড়ার সাথে সাথে যাত্রার দল আসতে শুরু করতো গ্রামেগঞ্জে। মিনার্ভা অপেরা, স্বদেশী অপেরা, আরও কতো নাম না জানা যাত্রার দল! রাস্তায় রাস্তায় কাড়া বাজিয়ে, মুখে গ্রামোফোনের চোঙ লাগিয়ে প্রচার করা হতো সেইসব যাত্রা পালার মাহাত্ম্য। গ্রাম জুড়ে পড়ে যেতো হৈ চৈ। ছেলে বুড়ো দল বেঁধে ছুটতো যাত্রার প্যাণ্ডেলের দিকে। লোক থৈ থৈ চারদিক। বৌ-ঝিরা সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে প্রস্তুত হতো যাত্রায় যাবার জন্য। চারদিকে মাটিতে বিচালির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসনের ওপর লোকজন বসে যেত। বৌ ঝিদের জন্য দড়ি টানিয়ে আলাদা বন্দোবস্ত সবার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে। প্যাণ্ডেলে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। একদিন তো আমরা জায়গা না পেয়ে মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। কী করা যায়? বন্ধুদের একজন যুক্তি দিলো, ব্যাঙ খুঁজে বের করো।

–ব্যাঙ দিয়ে কি হবে?

– আরে করই না ছাই।

যেই কথা, সেই কাজ। আমরা লেগে গেলাম ব্যাঙ খুঁজতে। অবশেষে একজনের পুকুর ধারে কচু গাছের ঝোপে পাওয়া গেলো ইয়া বড় একটা কোলা ব্যাঙ। তো সবাই মিলে কাগজের ঠোঙায় পরে সেই ব্যাঙ নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম মঞ্চের ঠিক সামনের দিকে। আর ছেড়ে দিতেই কোলা ব্যাঙের সে কী লম্বা লম্বা লাফ। তার সাথে পাল্লা দিয়ে দর্শকরাও শুরু করলো লাফালাফি। সুযোগ বুঝে আমরা সামনের দিকে যে যার মতো করে বসে পড়লাম। তারপর সে কী উৎকণ্ঠা, কখন এ্যাকটররা মঞ্চে এসে হাজির হবে। দুরে সাজঘরের পর্দা একটু নড়লেই, আমরা চাঙা হয়ে বসে ভাবি, এই বুঝি এলো। কিন্তু না...। এমনি করে আমাদের উৎকণ্ঠা যখন চরমে, তখুনি এক দুই করে তিনবার হুইসেল পড়তেই মঞ্চে লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাজা হরিশচন্দ্র। কী তাঁর চমক লাগানো অভিনয়, তার পোশাকের জেল্লা, চোখ-ধাঁধানো রীতিমতো। আর তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ডেল সুদ্ধ লোক আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, 'শাবাশ শাবাশ' বলে। আমরাও অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে পড়লাম। বাড়ি ফিরে এসে লুকিয়ে চুরিয়ে সেই অভিনয় নকল করার চেষ্টা করতাম। কতোদিন কেটেছে এইভাবে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন গ্রামোফোনের বড় একটা বেশি চল হয়নি। মনে পড়ে, আমাদের গ্রামের বাড়ি লাগোয়া বাড়ির এক হিন্দু ভদ্রলোক কোলকাতা থেকে একবার একটা গ্রামোফোন নিয়ে এলেন। বাকসের সাথে বিশাল চোঙঅলা সেই গ্রামোফোন। আমরা বলতাম, কলের গান। আশ্চর্য সেই কলের গান। থালার মতো একটা চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই। আর তার থেকে কী মজার মজার সব গান বের হচ্ছে। দেখে তো আমাদের তাক লেগে যাবার যোগাড়। আবার মাঝে মাঝে দম ফুরিয়ে গেলে তাকে সচল করার ব্যবস্থা ও আছে। কেটা হ্যান্ডেল ধরে কষে কয়েকবার পাক ঘোরাও, ব্যস দম এসে গেলো। সেই গ্রামোফোন শোনার জন্য গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মায়, বৌ-ঝিরা পর্যন্ত গিয়ে হাজির হতো এই বাড়িতে। সবাই যাতে শুনতে পায়, সেজন্য উঁচু টেবিলের ওপর রাখা হতো সেই গ্রামোফোন। তারপর অনেক রাত ধরে সবাই শুনতো হরেক রকমের গান গায়ক-গায়িকাদের সে কী গলা! ঠিক যেনো বাঁশির সুর। কমলা ঝরিয়া, আঙুর বালা দেবী, আব্বাসউদ্দিন-এমনি আরো অনেকের গান আমরা শুনতাম সেই সময়। এরপর থেকে যে বাড়িতেই গ্রামোফোনের খোঁজ পাওয়া যেতো আমরা দল বেঁধে ছুটতাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে। আর হিজ মাস্টারস ভয়েসের সেই কুকুরের মতো অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে চোঙের কাছে কান লাগিয়ে শুনতাম সেইসব কলের গান।

১৯৩৪-এর দিকে বাবা বদলি হলেন রানাঘাটে। সেখান থেকে পার্বতীপুর। আমরাও বাবার সাথে সাথে চলে এলাম পার্বতীপুর। মূলত বাবার এই ঘন ঘন বদলির কারণে, আমার পড়াশোনা তেমন এগোতে পারেনি। তবে দুনিয়াদারি সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছিলো বিস্তর। তখন প্রায় লোকেরই মুখে মুখে ফিরতো একটা নাম-মহাত্মা গান্ধী। ফিরতো তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়া সেই সব তরতাজা তরুণ বিপ্লবীদের কথাও। শুনতাম বাবাদের মুখে। যাঁরা নিজের জীবন তুচ্ছ করে দেশের আর দশের জন উৎসর্গ করছেন প্রতিনিয়ত নিজেদের অমূল্য জীবন।

আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন বাবার এক সহকর্মী বন্ধু। ভদ্রলোক ছিলেন স্বদেশী। বাবার অনুরোধে একদিন তিনি আমাদের পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার আদৌ কোনো মনোযোগ ছিলো না। তিনি অবশ্য যথেষ্টই কসরত করতেন আমাদের নিয়ে, বিশেষ করে আমার পড়াশোনার ব্যাপারে। কিন্তু আমি পড়াশোনা করতে চাইতাম না বলে ভদ্রলোক একসময় আমাকে লোভ দেখাতে শুরু করলেন এই বলে, আমি যদি পড়াশোনা করি, তবে তিনি মণ্ডা-মালপো যা কিছু আমি খেতে চাইবো, তাই খাওয়াবেন। এই লোভে আমার পড়াশোনার কাজ কিছুটা এগুতে লাগলো। তবে পড়ার চাইতে আমি বেশি যেটা পছন্দ করতাম, তাহলো স্বদেশীদের গল্প। তখন বৃটিশ রাজকে তাড়াবার জন্য যুবক-তরুণরা হাতে তুলে নিয়েছেন অস্ত্র। তাঁদের সেই সব রোমাঞ্চকর তৎপরতার কাহিনী তখন লোকের মখে মুখে। মাস্টারদা, বাঘা যতীন, প্রীতিলতা-এরা তখন কিংবদন্তির নায়ক নায়িকা। ধুতির কোঁচায় পিস্তল গুঁজে রাখা, বোমাবাজি করা এসব ছিলো আমাদের কাছে সত্যিকারভাবেই রোমাঞ্চকর ঘটনা। স্বদেশী ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনতাম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মাস্টারদার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতা ও কল্পনার সাহসিকতার গল্প। এইসব কথা বলতে বলতে এক একদিন দেখতাম আমার মাস্টার মশাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তার চোখ দুটো অজানা আক্রোশে ধিকি-ধিকি জ্বলে উঠছে।

সেসব গল্প শুনতে শুনতে আমারও মনে হতো, হায়, আমার কোমরেও যদি এমনি একটা পিস্তল থাকতো, আমিও যদি স্বদেশী হতে পারতাম! মোটামুটি তখন থেকেই স্বদেশীদের ওপর আমার একটা মোহ জন্মে গিয়েছিলো।

বাবা পার্বতীপুর থেকে পার্সেল ট্রেনে করে প্রায়ই কোলকাতা যেতেন। কোলকাতা থেকে তখন স্বদেশীদের কতো রকমের খবর আসতো। আমার দারুণ ইচ্ছে হতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলকাতায় গিয়ে স্বদেশীদের দেখতে। একবার আমরা ক'বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, কোলকাতা যাবোই। হয় এসপার, নয় ওসপার। যেই ভাবা, সেই কাজ। গেলাম কোলকাতায়। কিন্তু স্বদেশী দেখার শখ পূরণ হলো না।

এবার বাবা বদলি হয়ে এলেন ঈশ্বরদী। আমার তখন কতোই আর বয়স, ১৪ কি ১৫ বছরের মতো। ঈশ্বরদীতে আফসার ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলতে গেলে সর্বক্ষনের সঙ্গী। পরবর্তীকালে এই আফসারের ছোট বোনই হয়েছিলো আমার সহধর্মিনী। সে কথা পরে আসবো।

আমার আর একজন বন্ধু ছিলো। নাম ওর মুসা। বড়লোকের বখে যাওয়া ধন। ওই বয়সেই ও তাস ধরেছিলো। আর মুখে শোভা পেতো সবসময়ই 'রাম রাম' ব্রাণ্ডের সিগারেট। দেদার পয়সা ওড়াতো সিগারেট আর জুয়ার পেছনে। তখন তো পয়সার দাম ছিলো। এক পয়সা হলেই চা-পান আর 'রাম রাম' সিগারেট ফুঁকে সারাদিনই চালিয়ে দেয়া যেতো। মুসাকে দেখতাম প্রতিদিনই বাবার পকেট কেটে চার-পাঁচ পয়সা করে নিয়ে আসতো আর তাই দিয়ে চলতো আমাদের ফুর্তি। পরে, সংসার জীবনেও মুসার এই তাস খেলা আর পয়সা ওড়ানোর অভ্যেসটি থেকেই গিয়েছিলো। পরে যা হবার হয়েছিলো। বাবার সব সম্পত্তি আর টাকা-পয়সা ঢেলেছিলো সে তার জুয়ো আর নেশার পেছনে। এখন সে ভিক্ষে করে।

তো সেই আফসার, মুসা আর আমি-এই ত্রিরত্ন মিলে হেন অকাম নেই, যা করিনি। একবার আমাদের স্কুলের হেড মৌলবী সাহেবের গাছে ডাব পাড়তে গিয়ে কী নাস্তানাবুদ হয়েছিলাম, সে ঘটনা মনে পড়লে এখনো হেসে উঠি।

মৌলবী সাহেবের ঘরের পেছনের ডাব গাছটায় প্রচুর ডাব ধরতো। বিশ-পঁচিশটা করে ডাব নিয়ে এক-একটা কাঁদি ঝুলতো। দেখে লোভ সম্বরণ করা দায় হয়ে পড়তো।

আমরা পরামর্শ করলাম, এই ডাবের পানি পেটে না দিলেই নয়। অতএব, যথাকর্তব্য স্থির। মাঝরাতের দিকে উঠে রওনা হলাম তিনজন। আমাদের ভেতরে আফসার ছিলো গাছে বাইবার ব্যাপারে ওস্তাদ। দড়ির গোছা কোমরে পেঁচিয়ে ও তরতর করে উঠে গেলো সোজা ডাব গাছের মাথায়। আর দড়ির অপর প্রান্ত কেটে কেটে দরি ওপর দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে, আর সড়সড় করে সেই ডাবের কাঁদি রোপওয়ের ওয়াগনের মতো এসে হাজির হচ্ছে আমাদের কাছে। এ-ভাবেই কাজ চলছিলো। কিন্তু বিধি বাম! হঠাৎ একটা ডাব ছুটে গেলো কাঁদি থেকে। আর পড়বিতো পড়, একবারে মালীর ঘাড়ে মানে মৌলবী সাহেবের টিনের চালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর। ভীষণ শব্দে মৌলবী স্যারের ঘুম ভেঙে গেলো। আর ভাঙতেই তিনি 'কে? কে? চোর! চোর!' বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে তুললেন। আফসার তো পড়িমরি করে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে এলো। সে রাতে ডাবের বোঝা পিঠের ওপর রেখে, আমরা কোনো রকমে ক্রলিং করে ঘরে ফিরেছিলাম।

পাকশী রেল কলোনির উত্তর-পূর্ব দিকে যে বিশাল মাঠটি আছে, সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছুদিন আগ থেকেই গোরা সৈন্যদের ট্রেনিং দেয়া হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে রেলের কর্মচারিদের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো এই মাঠেই। মাঠের মাঝ বরাবর একটা চাঁদমারিও সে সময়ই তৈরি করা হয়েছিলো রাইফেলের টার্গেট ট্রেনিং-এর জন (চাঁদমারিটি আজও আছে। এখন সেখানে রেলওয়ে নিরাপত্তা ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে)। সেই মাঠকে তখন সবাই বলতো গোরার মাঠ। শীত নামার সাথে সাথে দলে দলে গোরা সৈন্য এসে ছাউনি ফেলতো সেই মাঠে। আশপাশের সমস্ত গ্রামে তখন হৈ চৈ পড়ে যেতো। মাঠের চারপাশ ঘিরে দোকানপাট বসে যেতো। মদের দোকান, পান-বিড়ি-সিগারেট আর পাউরুটি, বিস্কুটের দোকান, এমন কি অস্থায়ী পতিতালয় পর্যন্ত খোলা হতো। যদিও তখন সাড়াঘাটে একটা স্থায়ী পতিতালয় ছিলো।

গোরার মাঠে সামরিক ট্রেনিং নিতে তখন যে শুধু গোরা সৈন্যরাই আসতো, তাই নয়। আসতো গূর্খা, শিখ, পাঞ্জাবি আর বাঙালি সৈন্যরাও। সারাদিনই পি,টি, প্যারেড আর রাইফেল শুটিং চলতো। আমরা ঈশ্বরদী থেকে দল বেঁধে ছুটতাম গোরার মাঠের ট্রেনিং দেখতে। চারদিকে লোক থৈ-থৈ করতো। মেলা বসে যেতো যেনো। সেই কুচকাওয়াজ দেখার ফাঁকে ফাঁকে আমরা সৈন্যদের সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আর উর্দুতে কথা বলে ভাব জমাবার চেষ্টা করতাম। এর ফলে আমাদের বরাতে জুটতো বিস্কুট-সিগারেট আর পনির এই ধরনের ভালো ভালো খাবার। কুচকাওয়াজ দেখার নেশার সাথে সাথে এই লোভটাও আমাদের টেনে নিয়ে যেতো গোরার মাঠে। সে সময় বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই মিলিটারিতে নাম লেখানোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলো। একদিন আমার বন্ধু আফসারতো গোপনে মিলিটারিতে নাম লিখিয়ে চলেই গেলো দেশ ছেড়ে। সেনাবাহিনীর সেই বৈচিত্রময় জীবন তাকে আকৃষ্ট করেছিলো। আফসারে বাবা-মা ছেলের এই দেশান্তরী হওয়াতে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বেশ ক'বছর আর্মিতে কাটাবার পর তার মোহভঙ্গ হলো। এরপর ছুটিতে বাড়িতে এলে আর যেতে চাইতো না। আমরা জিগ্যেস করলে বলতো, "বড় কঠিন ব্যাপার। আমার ধাতে সয় না।"

শেষ পর্যন্ত আফসারের বাবা বেশ কিছুদিন পাবনার সিভিল সার্জন অফিসে ঘোরাঘুরি করে নগদ এক হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে, টি.বি. সার্টিফিকেট যোগাড় আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা পেশ করে ছেলেকে আর্মি থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। মনে আছে, পাবনার যাবার দিন আফারের বাবা এক খুঁতি (ছোট বস্তা) কাঁচা টাকা মুটের মাথায় তুলে দিয়ে সিভিল সার্জনদের ঘুষ দিতে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাকশী গোরার মাঠে এতো সৈন্য ট্রেনিং নিতে আসতো যে, তাদের রাইফেল শুটিং-এর জন্য সাড়াঘাটে আরও একটা চাঁদমারি তৈরি করতে হয়েছিলো।

কয়েক বছর আর্মিতে থেকে আফসারের চেহারা হয়েছিলো একেবারে গোরা সাহেবদের মতোই সুট-কোট পরে, পায়ে পাম সু আর ঠোঁটে 'রাম রাম' সিগারেট লাগিয়ে যখন সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতো, তখন বলতে কি, আমার হিংসেই হতো বন্ধুটির ওপর। মনে মনে ভাবতে শুরু করলাম, আর্মিতে গেলে কেমন হয়? আর্মিতে গেলে আমিও তো ওমনি সাহেব বনে যেতে পারতাম। তখন বৃটিশ সৈন্য সম্পর্কে লোকজনের একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিলো। যে সে কথা নয় বাবা, স্বয়ং রাজার সৈন্য! যার রাজত্বে সূর্য ডোবে না।

আর্মি থেকে পালিয়ে আসার পরপরই আফসারের বিয়ে ঠিক হলো মালঞ্চিতে। আমরা বন্ধুর বিয়ের আনন্দে মেতে উঠলাম। আর সে আনন্দ চললো বেশ কদিন ধরে। আফসারদের বাড়িতে আমার ছিলো অবারিত দ্বার। তার মা আমাকে খুব আদর করতেন কিন্তু বাবা তেমন পছন্দ করতেন না। আফসারের ছোট বোন মরিয়ম কেনো জানি না আমাকে দেখে খুব লজ্জা পেতো। আমার খুব ভালো লাগতো মেয়েটিকে। দেখতে শ্রী আর গায়ের রংও ছিলো একেবারে টকটকে ফরসা। আফসারের বড় বোনও ছিলেন খুব ভালো মেয়ে। আমাকে ছোট ভাইয়ের মতোই আদর করতেন। আমাদের তুলনায় আফসারদের বাড়ির অবস্থা বেশ ভালোই ছিলো বলতে গেলে। ওর বাবা রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেড মিস্ত্রি ছিলেন। তাছাড়া ঈশ্বরদীতে পাকাবাড়ি আর বেশ কিছু স্বয়সম্পত্তিও ছিলো তাঁর।

আর্থিক সচ্ছলতার কারণে সেই সময়কার শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর তেমন উৎসাহ ছিলো না। বরং এ জাতীয় ব্যাপারস্যাপারকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করতেন তিনি। সরকারের অনুগত থাকাটাকেই তিনি একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। কাজেই আমার মতো রাজনীতি করা ছেলে তাঁর বাড়িতে হরহামেশা যাতায়াত করুক এটা তিনি বলতে গেলে চাইতেনই না। তবুও ঐ আফসারই ছিলো আমার বাল্য আর যৌবনের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও বৃটিশ বিরোধী একটা মনোভাব তাঁর মধ্যে আমি সক্রিয় দেখেছি। শ্রমিক আন্দোলনের খবরাখবর তো বটেই, পাশাপাশি লীগ, কংগ্রেস আর স্বদেশীদের তৎপরতা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন। মাকে প্রায়ই এসে এসব খবর শোনাতেন। বাবার এই উদারনৈতিক মনোভাবের কারণেই রাজনীতিতে আমার পক্ষে সক্রিয় হওয়া সম্ভব হয়েছিলো। প্রকারান্তরে প্রথমাবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের সাথে আমার জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বাবার মৌন সমর্থন সম্ভবত ছিলো। কারণ, কোনোদিনই তিনি আমার আন্দোলন-সংগ্রামের পথে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করেননি।

আমার ঈশ্বরদীর দিনগুলো ছিলো সত্যিই রোমাঞ্চে ভরা। সেই সময় আমরা প্রায় প্রায়ই কোলকাতা যেতাম। একটা সময়তো কোলকাতায় যাতায়াতের ব্যাপারটা আমার কাছে ডাল-ভাতের মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

সে সময় কোলকাতায় জোরেশোরে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন চলছিলো। প্রতিদিনই মিটিং মিছিলে গরমাগরম অবস্থা। আমি কোলকাতায় যেতাম কেবল এসবের খবর নিতেই। কেনো জানি না আন্দোলনের খবর শুনতে আমার খুব ভালো লাগতো। তাছাড়া তখনকার দিনে ঈশ্বরদী থেকে লোকজন হরহামেশা ওখানে বাজার করতে যেতো। আমি যখন কোলকাতায় যেতাম দাদী সর্বসাকুল্যে আট আনা পয়সা গুঁজে দিতেন হাতে। তাই দিয়ে মোটামুটি বাজার হয়ে যেতো।

AMARBOI.COM

শুধু দাদীর কথাই বা বলি কেনো? আশপাশের বৌ-ঝিরা পর্যন্ত সৌখিন জিনিসপত্র কেনাকাটা করে আনবার জন্য সাধ্য সাধনা করতেন আমাদের, "বাবা জসীম, চারটে পয়সা দেব, কোলকাতা থেকে আমাকে অমুক জিনিসটা এনে দিস না বাবা!" বলতাম, "চার পয়সায় হবে না জেঠী, কমসে কম দুআনা দাও। তাহলে তোমার জিনিসপত্র ঠিকমতো পৌঁছে যাবে।" জেঠী বলতেন, "তাই সই, এনে দিস বাবা।"

তখন কলকাতায় যাবার তো গাড়ির অভাব ছিলো না। কত গাড়ি!" দার্জিলিং মেল "আসাম মেল" "সুরমা মেল"। আবার হাওড়া লাইনে তুফানের বেগে ছুটতো "তুফান মেল" যখন তখন যাওয়া, আবার বেলাবেলি ফিরেও আসা যেতো সেসব ট্রেনে করে।

এরপর একদিন বাবা নিজেই বদলি হলেন কলকাতায়। আমার অনেকদিনের শখ পুরলো এবার। এখন থেকে প্রাণভরে স্বদেশী দেখা যাবে। স্বদেশীদের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেশা যাবে। আমাদের বাসা হলো নারকেলডাঙ্গা কলোনিতে। চারপাশে তার প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলে গেছে বড় বাজারের রাস্তা। রাস্তার ওপর নারকেলডাঙা ব্রিজ। সেই রাস্তা ধরে দুপুরের খর রোদে মিছিল করে চলে যেতো অগ্নিযুগের অগ্নিপুরুষরা। আর মিছিলের পুরোভাগে দৃপ্ত পদভারে বুক চিতিয়ে হেঁটে যেতো শ্রমিকের দল। তখন সমস্ত কোলকাতাই পরিণত হয়েছিলো যেনো মিছিলের নগরীতে। ইংরেজ খেদাবার জন্য সমস্ত শহরের মানুষ যেনো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নারকেলডাঙা কলোনির আমরা কজন কিশোর প্রাচীরের ওপর বসে বসে দেখতাম সেইসব মিছিল আর পদযাত্রা। মিছিল থেকে "ইংরেজ বেনিয়া এদেশ ছাড়ো, ভারত মাতাকে মুক্ত কর", "লাল ঝাণ্ডা কি জয়", "ভারত মাতা কি জয়" ইত্যাদি স্লোগান উঠতো। আবার অবাঙালি শ্রমিকরা গর্জে উঠতো, "পুকার তা হায় ইনসান রোটি কাপড়া আউর মোকাম।" সে সময় অসহযোগ আন্দোলন সবে শেষ হয়েছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশ প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের। দেশ জুড়ে তখন উথালপাতাল অবস্থা।

প্রতিদিন মিছিল দেখে দেখে আর স্লোগান শুনে শুনে আমার মনে হতো এই ডাল ভাত কাপড় আর থাকার জায়গা হলে আর চাই কি! এরাই খাঁটি লোক, এরাই আমাদের কথা বলে। আমাকে এদের সাথেই থাকতে হবে। মনে মনে উৎসাহবোধ করতাম মিছিলে যাবার জন্য। মাঝে মাঝে মিছিলের লোকজনও আমাদের ডাকতো, "এই খোকারা চলে এসো আমাদের মিছিলে।" আর কী অবাক ব্যাপার, একদিন সত্যি সত্যি সম্মোহিতের মতো আমরা দল বেঁধে যোগ দিলাম লাল ঝন্ডার মিছিলে। প্ল্যাকার্ড তুলে নিলাম দৃঢ় দুই হাতে। উঁচিয়ে ধরলাম লাল ঝাণ্ডা। তারপর থেকে শুরু হলো নিয়মিত মিছিলে যোগ দেয়ার পালা। মনে মনে নিজেকে কল্পনা করতাম লাল ঝাণ্ডার একজন বলিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে। মিছিল ছুটতো ধর্মতলা আর বউ বাজার ঘুরে মনুমেন্টের দিকে। মাঝে মাঝে থেমে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন শ্রমিক নেতারা। সেসব বক্তৃতার কী তেজ! বুকের গভীরে ঢুকে রক্তে মাতম লাগিয়ে দিতো। প্রতিদিন মিছিলে যোগ দেয়ার পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো। ইংরেজ বিরোধী মনোভাব আমার মধ্যে জেগেছিলো সেই ছোটবেলা থেকে, যখন কুঠিয়াল ইংরেজদের অত্যাচারের কথা শুনেছিলার্ম। সেই ইংরেজের প্রতি আমার ক্ষোভ মেটাতেই তখন আমি মিছিলে যেতাম। ভাবতাম, মিছিলে দাঁড়িয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য অনায়াসে ইংরেজকে গাল দেয়া যায়। সমস্ত ভয়, সমস্ত সঙ্কোচ ধুয়েমুছে যায় এই মিছিলে দাঁড়ালে। এই তো জীবন! এই তো আমার আজীবনের প্রত্যাশা।

মনুমেন্টের পাদদেশে এসে থেমে যেতো মিছিলের দুর্বার গতি। তখনকার বিশাল বিশাল সব সমাবেশে বক্তৃতা করতেন আজকের দিনের স্মরণীয় বরণীয় নেতারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনি একদিন মনুমেন্টের সভায় এলেন একজন ভদ্রলোক। পরনে খদ্দরের পোশাক। সে কী আকাশ কাঁপানো বক্তৃতা তাঁর। যেন খাঁচায় বন্দি সিংহ অবিরাম গর্জন করে চলেছে। এই নেতার নামটা আজ আর মনে না থাকলেও তাঁর সেই বক্তৃতার স্মৃতিটুকু আজো আমার অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। তাঁকে দেখে আমার সেদিন মনে হয়েছিলো, একদিন আমিও এমনি করেই বক্তৃতা করবো হাজারো ভুখা-নাঙা মানুষের সামনে। মনুমেন্টের সভায় জওয়াহেরলাল নেহরুকেও আমি বক্তৃতা দিতে দেখেছি। দেখেছি তাঁর সাথে তাঁর চাঁদের মত ফুটফটে মেয়ে ইন্দিরাকেও। দেখে চোখ জুড়িয়ে যেতো। তখনকার ইন্দিরাকে দেখলেই বোঝা যেতো, এই মেয়ে একদিন দেশনেত্রী হয়ে উঠবেন। শুধু তাই নয়, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আর মওলানা আজাদসহ এমনি আরও কতো নেতাকে যে তখন মনুমেন্টের পাদদেশে বক্তৃতা করতে দেখেছি, তার শেষ নেই। সবার নাম আজ আর মনেও নেই।

মনুমেন্টের এই রকমের সভা সমাবেশ শেষে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ধুম পড়ে যেতো। আমরা যারা অল্প বয়সের, তাদেরকে বলা হতো বিলিতি কাপড় সংগ্রহ করে আনার জন্য। কতোদিন আমরা আউটরাম ঘাটে স্নানরতা মহিলাদের বিলিতি কাপড় চুরি করে এনে নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছি। সে সময় অবশ্য আজকের মতো হাওড়ার পুল ছিলো না। সম্পূর্ণ পুলটা তখন বসানো ছিলো বোটের ওপর ভাসমান অবস্থায়। মোটর গাড়ি পুলের ওপর উঠলেই সেটা কয়েক ইঞ্চি ঢেবে যেতো পানিতে। আমরা বিলিত কাপড় চুরির ধান্ধায় প্রায়ই হাওড়ার পুলের আশপাশে গঙ্গার ঘাটে ঘুরঘুর করতাম।

কৈশোরকালের সাময়িক উচ্ছ্বাসে সেদিন যে মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম, আজো জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও হাঁটছি সেই একই মিছিলে। মিছিল আমাকে ছাড়েনি। আমিও ছাড়তে পারিনি মিছিলকে। এটাই তো আমার জীবনের সবচাইতে বড় গর্ব। সবচাইতে বড় পাওয়া।

তারপর বহু বছর পেরিয়ে আসবার পর যখন ১৯৮৯ সালে কোলকাতায় সিপিআই-এর কংগ্রেস উপলক্ষে আমাকে সেই একই মনুমেন্টের পাদদেশে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিলো, সেদিন অতীত স্মৃতি স্মরণ করে আমার বুক আরো একবার গর্বে ফুলে উঠেছিলো। সে সময় লাল ঝাণ্ডার সভামঞ্চ থেকে যেসব জ্বালাময়ী সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো, আজ অনেক কিছুই তার ভুলে গেছি। তবু যেটুকু মনে আছে তার উল্লেখ করছি। গানগুলো সেই সময়কার কোনো জনপ্রিয় গীতিকার সুরকারের রচিত ছিলো কিনা, এখন আর সে কথা মনে নেই। তবে সেসব গান বেশ জনপ্রিয় ছিলো। শ্রমিকদের মনের কথাই ফুটে উঠেছে সেইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের ভেতর দিয়ে। এ রকমই একটি গান তখন খুব বেশি ঘুরতো শ্রমিকদের গলায় গলায়। গানের ক'টা লাইন ছিলো এরকমের :

নাকের বদলে নরুন পেলাম
নাক ডুমা ডুম ডুম।
জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম
লাগল দেশে ধুম।।
আমার ছেলে বড় বোকা
বুড়ো আঙ্গুল চোষে,
সে ক্ষিদে পেলে যখন তখন
হঠাৎ কেঁদে বসে।
সে বড় বোকা কিনা?
ক্ষুধা হরণ গুলি বিনা
চোখে তাহার আসবে না ঘুম
নাকের বদলে নরুন পেলাম
নাক ডুমা ডুম ডুম।
মার্কিন দেশের মার্শাল মাসী (ভিক্টোরিয়া)
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুম ঝুম,
নাকের বদলে নরুন পেলাম
নাক ডুমা ডুম ডুম।

আর একটি গান ছিলো এ-রকমের :

টাকার গরম চলবে না আর
ওরম টাকা ধরে গাছে
কুলি-মজুর, বলবে না হুজুর
তাদের দেমাক বেড়েছে।

সে সময় বিহারী শ্রমিকরা গাইতো একটি উর্দু গান। বেশ জনপ্রিয় ছিলো। তার ক'টা লাইন এখনো মনে পড়ে :

মেরে দেশ মে আয়া কৌন
মেরে খানা খায়া কৌন
আঁখ না দেখা না
মার মারকে ভাগা দেগা
লন্ডন কা দিওয়ানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতছানি : যৌবনের

আস্তে আস্তে মিছিলে যোগ দেয়া, যেখানেই হোক জনসভা শুনতে যাওয়া নারকেলডাঙা রেল কলোনির ছেলেদের একটা নেশায় পরিণত হলো। ধর্মঘটের স্লোগান শুনলেই আমাদের বুকের মধ্যে আগুন ধরে যেতে। তখন ধর্মঘটকে আমরা গণ্ডগোল গণ্ডগোল খেলা মনে করতাম। শ্রমিক-জনতা যেখানে সেখানে পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়ছে, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে স্বগর্জনে স্লোগান দিচ্ছে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম স্লোগানে স্লোগানে কাঁপিয়ে তুলেছে আকাশ বাতাস এ যেকোন এক মহাতাণ্ডবলীলা। আমরা রেল কলোনি থেকে ছুটে যেতাম সেইসব স্লোগানমুখর মিছিলে। এক একদিন পাড়ার ছেলেরা খবর নিয়ে আসতো, "কোলকাতায় মিটিং হবে, চল গণ্ডগোল দেখতে যেতে হবে।" তখন আমরা কোলকাতা বলতে বুঝতাম গড়ের মাঠ।

কোনো কোনো দিন ট্রাম শ্রমিকরা সমবেত হতো শিয়ালদা স্টেশনের সামনের চত্বরে। খবর পেয়েই আমরা ছুটে যেতাম সেই সমাবেশে। লাল পাগড়িধারী বৃটিশের পুলিশ ঘিরে রাখতো চারদিক। তাদের উদ্দেশ্য করে সমেবত শ্রমিকরা বজ্রকণ্ঠে স্লোগান দিতো, 'বৃটিশের দালালরা হুঁশিয়ার'। আমরাও লাল পাগড়িদের লক্ষ্য করে সেই ক্রোধোন্মত্ত স্লোগানে গলা মেলাতাম।

সমস্ত কোলকাতাটাই যেনো তখন একটা বারুদের স্তূপ। এ নগরী যেন পরিণত হয়েছে মিছিলের নগরীতে। যখন তখন অলিতে গলিতে বুম বুম আওয়াজে ফেটে পড়ছে সন্ত্রাসীদের বোমা। কোলকাতার সন্ত্রাসীদের দমন করতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ একবার তো এক জবরদস্ত গোরা সার্জেন্টকে এনে হাজির করলো। বড় নিষ্ঠুর নৃশংস সেই গোরা সার্জেন্ট। নাম এন্ডারসন সাহেব। একটা বিরাট কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স নিয়ে স্বদর্পে কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। মিছিল কিংবা পথসভা দেখলেই কালো ঘোড়া দাবড়ে দিতো নির্বিচারে জনতার ওপর। ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতো মানুষজনের শরীর। তার ওপর তো নৃশংস লাঠিচার্জ ছিলই।

ক্রমে ক্রমে এই গোরা সার্জেন্টের অত্যাচার এমন চরমে উঠলো যে, কোলকাতার সন্ত্রাসীরা তার ওপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। এর আগে দিনক্ষণ ঠিক করে ধর্মতলার চৌরাস্তায় একদিন সন্ত্রাসীরা ঘিরে ফেললো গোরা এন্ডারসনকে। তাদের প্রত্যেক অলিতে গলিতে ওঁৎ পেতে অবস্থান গ্রহণ করে তারা। হাতে হাতে বোমা। কখন এসে হাজির হবে পাষন্ডটা সেই আশায় তাদের অধীর প্রতীক্ষা। যথাসময়ে বীর বিক্রমে স্বদলবলে কালো ঘোড়ায় চেপে হাজির হলো সাহেব। চারদিক থেকে স্লোগান উঠলো 'বন্দে মাতরম'। ক্রোধোন্মত্ত এন্ডারসন স্লোগানের উৎস সন্ধানে চক্কর দিতে লাগলো ধর্মতলার চৌমাথায়। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় গলির ভেতর থেকে তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এলো হাতবোমা। শব্দ হলো বুম। একই রকম শব্দ করে একের পর এক নিক্ষিপ্ত হলো পরপর আরো কয়েকটা হাতবোমা! ধোঁয়ায় ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো চারদিক। গোরা সাহেবের পার্শ্বচররা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালালো যে যেদিকে পারলো। বোমার আঘাতে এন্ডারসনের কালো ঘোড়াটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো রাস্তায়। আর ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো বৃটিশ সিংহ। নিঃসাড় পড়ে রইলো তার ঘোড়া। সন্ত্রাসীরা ভাবলো অক্কা পেয়েছে গোরা সাহেব। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে তারাও সটকে পড়ল নিমিষেই। মায়ের দুধের জোর ছিল বলে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলো এই বৃটিশ সিংহ। প্রাণের মায়া কার না আছে! তারপর থেকে আর কোনোদিনও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তৎপর হতে দেখা যায়নি তাকে।

সে সময় সন্ত্রাসীদের এই রোমহর্ষক কার্যকলাপ দেখা আমাদের নিত্যদিনের নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। লোকাল টেনে চড়ে প্রায়ই তখন চলে যেতাম বজবজ, খিদিরপুর, ডায়মণ্ড হারবার কিংবা যেখানেই মিটিং কিংবা মিছিল হতো, সেই সব জায়গায়। তখন যে কেবল যুবকদের মধ্যেই সন্ত্রাসীদের প্রভাব ছিলো, তা কিন্তু নয়। সব সময়ই দেখা যায় রাজনৈতিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তাকে বিপথগামী করতে শাসক শ্রেণী তৎপর হয়ে ওঠে। দমননীতি ছাড়াও একশ্রেণীর দালাল সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তারা। সেইকালের বৃটিশ শাসকরাও এ উদ্দেশ্যে থেকেই সূচনা করেছিলো ব্রতচারী আন্দোলনের। বৃটিশ সরকারের মদদপুষ্ট এই ব্রতচারী আন্দোলন তখন যুবকদের একটা বড় অংশের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। ব্রতচারী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো তরুণ যুবকদের সংগঠিত করার ভেতর দিয়ে খেলাধুলো আর শরীরচর্চা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজে ব্যস্ত রেখে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা। এ কাজে তারা সফলও হচ্ছিলো।

এই ব্রতচারী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোই ছিলো তখন আমাদের প্রধান কাজ। তবে এ রকমের প্রচার কাজে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ সরকারি টিকটিকি, অর্থাৎ সিআইডিদের নজর তখন বেশি করে থাকতো যুবকদের ওপর। কারণ কার কোমরে যে পিস্তল গোজা আছে আর কার পকেটে তাজা হাতবোমা, কিছুই বলা যেতো না। অতএব সব সময় চোখে চোখে রাখ ওদের, এই ছিলো কর্তৃপক্ষের নির্দেশ।

১৯৩৯ সাল। দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়ে গেছে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোল। আমরা কোলকাতায় বসেই তার আলামত টের পাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলেছে গোরা সৈন্যের দল। ধুলো উড়িয়ে ছুটছে মিলিটারি কনভয়। রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে, একই আলোচনা– যুদ্ধ বেঁধে গেছে। শিয়ালদহ আর হাওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনে একের পর এক এসে থামছে আর্মি স্পেশাল ট্রেন। কতো জাতের, কতো বর্ণের সৈন্য যে আসছে–যাচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কোলকাতায় চরম খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এঁদো বস্তির লোকজনদের অনেকেই না খেয়েও মারা যাচ্ছে। হু-হু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে অসৎ ব্যবসায়ীরা নিচ্ছে দাঁও মেরে।

আমাদের সংসারের অবস্থাও তখন শোচনীয়। চাল আনতে পানতা ফুরোয় অবস্থা। সারাদিন একবেলা খাবার জুটলেও পরের বেলা না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। সকালের নাস্তা সেরেই আমরা নারকেলডাঙা কলোনির ছেলেরা বেরিয়ে পড়তাম রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে। গোরা সৈন্যদের সাথে ভাঙাচোরা দু'একটা ইংরেজি বলে ওদের খুশি করতে পারলে কিছু খাদ্যের সংস্থান করা যেতো। আমরা তখন বেশ কসরত করে 'হেলপ মি", "গুড মর্নিং" আর থ্যাঙ্ক ইউ জাতীয় ক'টি ইংরেজি বাক্য রপ্ত করেছিলাম। স্টেশনের ধার-ঘেঁষা রাস্তায় দল বেঁধে দাড়িয়ে থাকতাম সৈন্যদের আসতে দেখলেই প্রথম অস্ত্র প্রয়োগ করতাম 'গুড মর্নিং স্যার' বলে। ওরা খুশি হয়ে বলতো 'গুড মর্নিং। তারপর বলতাম, 'হেলপ মি'। পেট দেখিয়ে ইশারা করতাম, পেটে ক্ষিধে। অমনি কাজ হতো। সৈন্যরা আমাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতো পাউরুটি, পনির আর বিস্কুটের টিন। আমরা সোল্লাসে বলে উঠতাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ'। এভাবেই দিন চলতে লাগলো।

১৯৪০-এর মাঝামাঝি সময়ের কথা। যুদ্ধ তখন চরমে। প্রায়ই কোলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে কাড়া পিটিয়ে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছে। আমার তখন বয়স ষোলোর মতো। গায়ে-গতরে মোটামুটি বেড়ে উঠেছি। এরই মধ্যে একদিন ঢোলের আওয়াজ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠলাম। বাসার বাইরে বেরিয়ে দেখি, আমাদের কলোনির পার্শ্ববর্তী বড় বাজারের রাস্তার ধারে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। আর একজন লোক সমানে ঢোল পিটিয়ে চলেছে। তারপর একসময় একজন বাবু গোছের লোক সামনে এগিয়ে এসে মুখে গ্রামোফোনের বিরাট একটা চোঙ লাগিয়ে স্বর উঁচুগামে তুলে ঘোষণা করতে লাগলো, "মেয়ো রোডে (গড়ের মাঠের শেষ প্রান্তে) বৃটিশ সেনাবাহিনীতে লোক নেয়া হবে। উৎসাহী যুবকদের সকাল ১০টার মধ্যে হাজির হবার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।"

খবর শোনামাত্র কলোনির যুবকরা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। আমরা ক'বন্ধু মিলে শলাপরামর্শ করতে লেগে গেলাম, কীভাবে বাড়ির লোকজনদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। যা হোক পরদিন সকাল সকাল আমরা ক বন্ধু গিয়ে হাজির হলাম মেয়ো রোডে। গিয়ে দেখি এরি মধ্যে বেশ কিছু যুবক ক্যাম্পের সামনে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরাও গিয়ে দাঁড়ালাম সেই লাইনে। কিছুক্ষণ পর এক গোরা আর্মি অফিসার এলেন। লাইনের সামনে দিয়ে ঘুরলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোরবানির ষাঁড় পছন্দ করার মতো করে মোটা তাগড়া এক একজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেছে নিয়ে বুকে-পিঠে থাপ্পড় মেরে, ঘাড়-গর্দান টিপেটুপে আলাদা লাইনে দাঁড় করাতে লাগলেন।

আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম সাহেবের বাছাই করা লাইনে। তারপর নাম-ধাম টুকে নিয়ে বললেন, "ওকে টোমডেরকে নিয়োগ করা হইল।" আমরা "ফল-ইন" অবস্থায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। এরপর বলা হলো, আজই সন্ধ্যায় খিদিরপুর থেকে জাহাজে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে সেই বোম্বের কাছে 'বৃটিশ কোচিন বন্দরে"। শুনে মনটা কেমন যেন দমে গেলো। বাড়িতে কাউকে বলে আসা হয়নি। তাছাড়া সঙ্গের বন্ধুরা বললো, আমাদের নাকি জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে সত্যি, কিন্তু গোরা অফিসারদের কোনোরকম সন্দেহ হলেই আর রক্ষে নেই, মেরে টুপ করে ফেলে দেবে সমুদ্রে। আমার তখন কতোই বা বয়স, আর্মির নিয়মকানুন সম্পর্কেতো আর অতোশতো জানিনে। হবেও বা। গোরাদের ওপর বিশ্বাস কি? সত্যি বলতে কি, খুবই ঘাবড়ে গেলাম।

যথাসময়ে ট্রাক এলো নতুন রিক্রুটদের তুলে নিতে। আমরা দুরুদুরু বুকে ট্রাকে গিয়ে উঠলাম। মনটা তখন পালাই পালাই করছে। ট্রাকের পেছনে বসে বসে চিন্তা করছি, কেমন করে পালানো যায়। এই রকম যখন মনের অবস্থা, ঠিক তখুনি সুযোগ এসে গেলো। এক ট্রাফিক মোড়ে এসে সঙ্কেত না পেয়ে ট্রাক গেলো থেমে। আর যায় কোথা, সুযোগ বুঝে ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে দে ভোঁ দৌড়। ছুটতে ছুটতে এসে পড়লাম একদম ট্রাম স্টপেজে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঢং ঢং ঘন্টা বাজিয়ে লম্বুড় মার্কা এক ট্রাম এসে হাজির। আজব গাড়ি এই ট্রাম! বাকসের মতো দু খানা বগি একসাথে বাঁধা। তার ওপর ছাদ থেকে দুটো বড় ডান্ডা ওপরে ঝোলানো তারের সাথে গিয়ে ঠেকেছে। আমি দৌড়ে এসে সেই ট্রামে চড়ে বসলাম। কিন্তু আরেক বিপদ! পকেটে তো একটা ফুটো পয়সাও নেই। ভাড়া দেব কোত্থেকে? গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মতো যথাসময়ে এসে হাজির হলেন টিকিট চেকার। হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরনে। টুপির ওপর লেখা বিটিসি। চেকার সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর কায়দার হাঁকলেন, 'টিকিট?' বললাম, 'পয়সা নেই। টিকিট কাটতে পারিনি। যা হোক শেষ পর্যন্ত বলে কয়ে একটা রফা হলো। তখন ট্রাম কর্মচারি আর রেল কর্মচারিদের মধ্যে আন্দোলনের সুবাদে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। রেল কর্মচারির ছেলে শুনে চেকার সাহেব নিরস্ত হলেন। বিনে টিকিটেই পৌছে দিলেন এসপ্লানেডে। শুধু তাই নয়, দয়াপরবশ হয়ে শিয়ালদহ রুটের ট্রামটাও দেখিয়ে দিলেন। আগের কায়দায়ই শেয়ালদা রুটের ট্রামের চেকারকে ম্যানেজ করে সেদিন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। পরে অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে আর্মির লোকজন আমার খোঁজ করেছিলো। তবে গ্রামের বাড়ির ঠিকানা দেয়া থাকায়, শেষ পর্যন্ত আমাকে আর খুঁজে পায়নি ব্যাটারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ভয়ে আর্মিতে নাম লিখিয়েও পালিয়ে এসেছিলাম, তার প্রকৃত তথ্যটি বেশ কিছুদিন পর আমার গোচরীভূত হয়েছিলো। বার্মা ও সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে বৃটিশ সেনাবাহিনীর গোরা জেনারেলরা জাপানীদের প্রচণ্ড মারের মুখে যখন নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো, তখন নিজেরা পেছনে নিরাপদ অবস্থানে থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফ্রন্টে এগিয়ে দিচ্ছিলো বলির পাঠার মতো। এভাবে সেইসব রণাঙ্গনে সে সময় বহু ভারতীয় সৈন্য মারা পড়ে। ফলে ভারতীয় সৈন্যদের ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভের জন্ম হতে থাকে। পরে অবশ্যি এই সুযোগটিই নিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ বোস। রাস বিহারী ঘোষ এবং তিনি নিজে জাপান ও জার্মান সরকারের সাথে সমঝোতা করে আজাদ হিন্দ ফৌজে এই সব যুদ্ধবন্দিকে (ভারতীয় যেসব সৈন্য বন্দি হতো জাপান বা জার্মানিদের হাতে) রিক্রুট করার ব্যবস্থা করেন।

আর্মিতে নাম লিখিয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এলেও চাকরি খোঁজার তাগিদ কিন্তু আমার শেষ হলো না। কারণ সেই দুর্মূল্যের বাজারে আমার একটা চাকরির একান্ত দরকার ছিলো। যদিও তখনকার দিনে ওই বয়সে কেউ চাকরির জন্য এতোটা লাচার হতো না। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ছিলো একেবারেই অন্যরকম। একে তো লাল ঝাণ্ডার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওদের সাথে দিনরাত কাজ করে বেড়াচ্ছি, তার ওপর যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। বাবা একা আর সংসার সামাল দিতে পারছিলেন না। ঠিক এই রকম অবস্থায় রাস্তায় আবার একদিন ঢোল পেটানোর শব্দ শুনলাম, তবে এবার আর আর্মিতে নয়, রেলে লোক নেবার ঘোষণা। ঢোলের শব্দের সাথে সাথে মুখে চোঙ লাগিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছিলো, আগামীকাল সকাল দশটায়---শিয়ালদহ স্টেশনে... ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে লোক ভর্তি করা হবে। ঘোষণাটা শোনামাত্র মনস্থির করে ফেললাম, এবার যে করে হোক চাকরি নিতেই হবে আমাকে।

পরদিন ঠিক সকাল দশটায় শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে হাজির। হাজির হয়েই সবার মতো দাঁড়ালাম লাইনে গিয়ে। তখন তো আর চাকরির জন্য তদ্বির তোয়াজের প্রয়োজন পড়তো না। শরীর স্বাস্থ্য ভাল হলে, কোনো রকমে লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই ছোটখাট একটা চাকরি জুটে যেতো।

দেখলাম রেলওয়ে স্টেশনে একটা পর্দা লাগানো দরজার সামনে তকমাঅলা একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে। নির্দেশ মতো এক এক করে ঘরের ভেতর লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক পড়লো এবার আমার। ভেতরে ঢুকেই তো আমার বুক ধুকপুক করতে লাগলো। দেখি পেল্লায় এক টেবিলের পেছনে গম্ভীর বদনে বসে আছেন এক গোরা সাহেব। মুখে বিরাট একখানা চুরুট। তার থেকে রেল ইঞ্জিনের মতো গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছেন। ভাবলাম, ইনিই তো আমার রুটিরুজির মালিক, তাই ঝটপট মনস্থির করে দিলাম মিলিটারি কায়দার একটা স্যালুট ঠুকে। এবার সাহেব একটু নড়েচড়ে বসে কড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কড়কড়ে গলায় হাঁকলেন, 'হোয়াটস ইওর নেম?"

প্রশ্নের ধরনে বুঝে নিলাম সাহেব আমার নাম জিগ্যেস করছেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, "জসীমউদ্দীন মণ্ডল, পিতা হাউসউদ্দীন মণ্ডল।" কিন্তু ক্ষান্তি নেই। কামানের গোলার মত ছুটে এলো এবার সাহেবের আর একটি প্রশ্ন, হোয়াটস ইয়োর ফাদার ডুইং..." এবার আমার ইংরেজির পুঁজি খতম। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাশ থেকে এক বাঙালি বাবু বুঝিয়ে দিলেন, "সাহেব তোমার বাপ কি করেন জিগ্যেস কচ্ছেন, ঝটপট উত্তর দাও।"
উত্তর দিলাম, "রেলওয়ে ম্যান।"
মনে হলো আমার জবাবে সাহেব যেনো কিছুটা প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, "এইজ?" বাঙালি বাবুটি আবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বললেন, "বয়স?"
বললাম, 'এইটিন'। চাকরি যাতে হয়, সেজন্যই বয়সটা একটু বাড়িয়ে বললাম। সব শুনে সন্তুষ্ট মনে সাহেব বললেন, "ওকে।" তারপর হাত ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললেন। সেই বাঙালি বাবুটি আমার নাম-ধাম-ঠিকানা ইত্যাদি লিখে নিয়ে বললেন, তোমার চাকরি হয়ে গেছে। এখন মেডিক্যাল টেস্টের জন্য যেতে হবে কাঁচলাপাড়া রেল হাসপাতালে।" কাঁচলাপাড়ায় তখন ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের বিরাট ওয়ার্কশপ। অফিস থেকে রেলের পাশ দেয়া হলো। মনে তখন আমার আনন্দ আর ধরে না। আমি এখন 'পাশ' পাওয়া রেলের কর্মচারী।

নতুন চাকরি পাওয়া আমরা ৪ জন পরদিনই রওয়ানা হলাম কাঁচলাপাড়ার উদ্দেশ্যে। কাঁচলাপাড়া রেলের বিরাট ওয়ার্কশপ। চারদিক তার উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কত রকমের মেশিনপত্র যে চলছে, তা গুণে শেষ করবার নয়। কাঁচলাপাড়া শহরটিও বেশ বড়। রাস্তায় সব গাড়ি ভ্যাঁক ভ্যাঁক ভেঁপু বাজিয়ে সারে সারে যাচ্ছে-আসছে। তখনকার দিনে মোটর গাড়ির ভেঁপু মানে ছিলো একটা বড় শিঙার সাথে লাগানো রাবারের বেলুন। সেই বেলুনে চাপ দিলেই ভ্যাঁক ভ্যাঁক আওয়াজ বেরুতো। যাই হোক, আমাদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হলো রেল হাসপাতালের বারান্দায়। কিছুক্ষণ পর কপালে চন্দনের ফোটা কাটা এক বাঙালি বাবু এসে বাজখাই গলায় নাম ডাকতে শুরু করলেন। একটা ঘরে বসে আছেন ডাক্তার বাবু আর আমাদের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাহেব। এই সাহেব আবার মাদ্রাজি। সবাই ডাকতো মোদক সাহেব বলে। ডাক্তার বাবু কিছুক্ষণ ধরে নানান পরীক্ষার পর আমাদের ছেড়ে দিলেন মোদক সাহেবের হাতে। মোদক সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কয়লা মারনে সাকোগে?'
আমি জবাব দিলাম, "ইয়েস স্যার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সেই ফোঁটা কাটা বাবুটি আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, "সাহেব যা কিছু জিগ্যেস করবেন, জবাবে তোমরা শুধু 'ইয়েস স্যার' বলবে। তা হলেই হবে।" তাই তার কথামতো আমরা 'ইয়েস' 'ইয়েস' বলে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলাম। বিকেল তিনটের দিকে সাহেব আমাদের হাতে চাকরির কিছু কাগজপত্র এবং সেই সাথে একগাদা উপদেশ খয়রাত করে বিদেয় করলেন। এর দু'দিন বাদে শিয়ালদহ লোকোশেডে এসে চাকরিতে যোগ দিলাম। এভাবেই ষোলো না পেরুতেই শুরু হল আমার চাকরির জীবন।

প্রথম দিনই আমাদের ক'জনকে চাইন্ডেল নামের একজন গোরা সাহেবের হাতে সোপর্দ করা হলো। করিতকর্মা চাইন্ডেল আমাদের তখুনি 'ডক' পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। হাতে ঝুড়ি আর কোদাল দিয়ে বললেন, "সারাদিনের মধ্যে এই ডকের সমস্ত ছাই হটিয়ে ফেলা চাই। সন্ধ্যার পরপরই আবার ইঞ্জিন এসে যাবে। অতএব, জলদি হাত চালাও।"

তখনকার দিনে ইঞ্জিনের ছাই ঝাড়ার জন্য ইয়ার্ডের ভেতর লাইনের মাঝখানে গর্ত করা থাকতো। এগুলোকেই বলা হতো 'ডক'। আমাদের কাজ হলো সেই ডক পরিষ্কার করা। সকাল থেকে দুপুর নাগাদ অমানুষিক পরিশ্রমের পর টিফিনের ভোঁ বাজলো। তখন চাইন্ডেল এসে বললেন, "এবার বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঠিক দুটোয় আবার এসে কাজে লাগবে।"

সারা গায়ে ছাই মেখে বাসায় ফিরলাম। ভূতের মতো চেহারা দেখে মা-তো কেঁদেকেটে একেবারে অস্থির। বাবা বললেন, "লেখাপড়া শেখেনি, ও-চাকরি ছাড়া আর কী করবে!" মা বললেন, "কলতলা থেকে গোসল সেরে আয়, আমি খাবার দিচ্ছি।" বাসার সামনেই বারোয়ারী কল। পাড়ার মেয়েদের গিজগিজে ভিড় সেই কলতলায়। আমার কালিঝুলি মাখা চেহারা দেখে সবাই তো ঠাট্টা জুড়ে দিলো। "কিরে জসীম, সারা গায়ে কালি মেখে সং সেজেছিস? শেষে কিনা এই চাকরি নিলি?"

এভাবেই শুরু হলো আমার রুটিন বাঁধা জীবন। মাস শেষে মাইনে পেলাম পনেরো টাকা। দু'দিনের বেতন কাটা গেলো গরহাজিরার কারণে। আমাদের বেতন পাওয়ার খবর শুনে চাঁদার বই হাতে এরি মধ্যে এসে হাজির লাল ঝাণ্ডা আর সবুজ ঝাণ্ডার দল। লাল ঝাণ্ডা অর্থাৎ আমাদের পার্টিকে চাঁদা দিলাম চার আনা। এরপর যখন পুরোপুরি লাল ঝাণ্ডার কর্মী বনে গেলাম তখন চাঁদা দিতে লাগলাম এক টাকা করে। এভাবেই লাল ঝাণ্ডার সুবাদে পার্টি অফিসেও শুরু হলো আমার একটু আধটু করে যাওয়া আসা। তবে তখনো পার্টির নেতাদের সাথে তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি। আমাদের শ্রমিকনেতা ইসমাইল ভাইয়ের মাধ্যমে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কমরেড আব্দুল হালিমের সাথে পরিচিত হয়েছি মাত্র। পার্টি অফিসে গেলে পেছনের বেঞ্চে বসে কমরেডদের কথাবার্তা শুনি। একদিন, ঝাঁকড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুলো বাউণ্ডেলে টাইপের একজন লোককে কমরেড মুজফ্‌ফর সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করতে দেখলাম। লোকটাকে আমার মোটেও পছন্দ হলো না। কারণে অকারণে হা হা করে হাসছে কেবল। কেমন যেনো বাচাল ভাব। অথচ নেতৃস্থানীয় সবাই তাঁর সাথে সমীহ করে কথা বলছেন। অবশেষে কৌতুহল দমন করতে না পেরে, ইসমাইল ভাইকে জিগ্যেস করেই বসলাম, "ভাই, এই বাঁচাল লোকটা কে?"

ইসমাইল ভাইতো আমার প্রশ্ন শুনে হতবাক! বললেন, "বলিস কিরে? ওতো কবি নজরুল!" শুনে আমিও সেদিন অবাক হয়েছিলাম। এই সেই নজরুল? যাঁর অতো নামডাক! সেই কবি এমন দিল খোলা? এমন হাসিখুশি। ভেবেছিলাম, 'বিদ্রোহী' কবি কতোই না গুরুগম্ভীর মানুষ!

ক্রমে ক্রমে লাল ঝাণ্ডার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমার বেশ পরিচিতি এসে গেলো। এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও এসে গেলাম একদিন। পার্টি অফিসে অনেক বড় বড় নেতা দেখে দেখে পার্টির প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ছে। একদিন কবি সুকান্ত এলেন পার্টি অফিসে। লাজুক লাজুক ভাবের রোগক্লিষ্ট চেহারার একজন কিশোর। মুখে সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। সবাই বলাবলি করছিলো, সুকান্ত ভালো কবিতা লেখে, পার্টি কমরেড। সে সময় সুকান্তকে দেখেছি পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সারাদিনই প্রায় খাটাখাটুনি করতে। পার্টি অফিসে সেই সময় আরো আসতেন বিখ্যাত নেতা পি.সি জোসী, এস.এ ডাঙ্গে। আরও কতো ব্যক্তিত্ববান কমরেড। পার্টির প্রতি তাঁদের আত্মত্যাগ আর অপরিসীম আনুগত্য দেখে আকর্ষ হয়ে যেতাম।

যে সময়ের কথা বলছি তখন তো আর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া চাট্টিখানি কথা ছিলো না। কমিউনিস্ট মানেই তখন ছিলো সোনার মানুষ, ত্যাগী নিষ্ঠাবান আর কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। আমার বহুদিনের আশা একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হবো। বিশ্বনাথ মুখার্জি, কমনীয় দাশগুপ্ত– এঁদের কী ত্যাগ আর তিতিক্ষা! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে করেই হোক, নিজের কর্মকাণ্ড দিয়ে এইসব দেশবরেণ্য সোনার মানুষের মনে আমাকে স্থান করে নিতেই হবে। লাল ঝাণ্ডার কাজ তাই আরো দ্বিগুণ উৎসাহে করে যেতে লাগলাম। আর পার্টি অফিসে ধন্না দেয়ার ব্যাপারটাতো আছেই। কারণে অকারণে পার্টির টুকরো-টাকরা কাজে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যাই। পুলিশের চোখ এড়িয়ে পোস্টার লাগানো ও লিফলেট বিলি করা ওসব কাজ উপযাচক হয়েই করে যেতে লাগলাম। ফলে পার্টির নেতাদের সুনজরে পড়ে গেলাম খুব তাড়াতাড়িই। তাই সবশেষে আমার ভাগ্যের শিকে ছিড়লো, প্রস্তাব এলো আমাকে পার্টি ক্যাডার করে নেয়ার। আমি তো একপায়ে খাড়া। আরও উৎসাহ ভরে সক্রিয় হলাম পার্টির কর্মকাণ্ডে। ১৯৪০ সালে এসে সদস্য হলাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। গর্বে সেদিন আমার বুক ভরে উঠেছিলো শোষিত মানুষের পার্টি, সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠন, তার আমি একজন সক্রিয় সদস্য হয়েছি, এই-কথা ভেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা এবং দেশভাগ

১৯৪১-৪২-এর দিকের কথা। বৃটিশ তখন সিঙ্গাপুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। জাপানিরা বিজয় গর্বে ঢুকে পড়েছে সিঙ্গাপুর। এবার বার্মা অধিকারের পালা। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে বার্মার রণাঙ্গনে। খবর আসছে মারগুই, টেভয় আর মৌলমেন জাপানিরা দখল করে নিয়েছে। বার্মার সর্বত্রই পালাই পালাই রব। বার্মা প্রবাসী বাঙালিরা পালিয়ে আসছে দলে দলে। কোলকাতার সর্বত্র গুজব, রাস্তাঘাট আর বাসে-ট্রামে সর্বত্র একই আলোচনা : জাপানীদের কোলকাতার দরজায় কড়া নাড়তে আর বেশি দেরি নেই। এই হলো বলো।

এরি মধ্যে আমার প্রমোশন হয়েছে সেকেণ্ড ফায়ারম্যান হিসেবে। ইঞ্জিন চালনায় আমার এখন একটা মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। আমরা ইঞ্জিনে কয়লা না মারলে ইঞ্জিন চলবে না।

বার্মায় বৃটিশের সাথে জাপানিদের প্রচণ্ড যুদ্ধের খবর কানে আসছে। আর সেই খবরে কোলকাতার মানুষগুলো আনন্দে আত্মহারা। ইংল্যান্ডের বিপর্যয় লক্ষ্য করে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ উৎফুল্ল ঠিক হয়েছে! ভাল হয়েছে! এতদিন ভারতের অসহায় মানুষের ওপর একতরফা গুঁতোনি চালিয়েছে বাবা বৃটিশ! এবার জাপানি গুঁতোনি কেমন লাগে, একটুখানি চেখে দেখো না বাছাধন!

তখন জাপানের নাম ভারতের প্রতিটি মানুষের অন্তরে গাঁথা। আজাদ হিন্দু ফৌজের প্রতিষ্ঠা, নেতাজী সুভাষ বোস এবং বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী ঘোষের জার্মান ও জাপানিদের সাথে সমঝোতার ফলে জার্মান ও জাপানিদের ভারতের মানুষ আপন বলে ভাবতে শুরু করেছিলো। আর কি না সেই জাপানের বিরুদ্ধেই বার্মায় যুদ্ধ চলছে! প্রচণ্ড যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বৃটিশদের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ আমরাই ট্রেনে করে পৌছে দিচ্ছি। আর সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে। না, এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না!

তখন বোম্বে ও মাদ্রাজগামী সব ট্রেনই চিৎপুর হয়ে যেতো। হরহামেশাই বার্মা রণাঙ্গনে বৃটিশের অস্ত্র বোঝাই ট্রেন চলাচল করছে। তো এরই মধ্যে একদিন চিৎপুর স্টেশনের চায়ের দোকানে বসে আমরা ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানের দল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, কেউ ইঞ্জিনে উঠবো না। বার্মার যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করা যাবে না। বন্ধ করতে হবে ট্রেন চলাচল। যেই কথা সেই কাজ। চিৎপুর স্টেশনে সমস্ত ট্রেন থেমে রইলো। চারদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। খবর পেয়ে রেলের গোরা সাহেবরা সবাই পড়িমরি করে ছুটে এলেন। প্রথমে হুমকি-ধামকি, তারপর অনুরোধ-উপরোধ। কিন্তু কিছুতেই ভবি ভুললো না। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল। অবশেষে গোরারা শরণাপন্ন হলেন আমাদের নেতাদের। খবর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে ছুটে এলেন কমরেড মুজফফর আর সোমনাথ লাহিড়ীসহ ক'জন নেতা। অনেক বোঝালেন আমাদের কিন্তু আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে তখনো অটল।

নেতাদের বললাম, "এতদিন বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেছেন, কিন্তু আজ যখন বৃটিশকে বাগে পাওয়া গেছে, তখন আপনারাই আবার সুর বদলে বলছেন, বৃটিশকে সাহায্য করো। এ আপনাদের কেমন ধারা নীতি?"

নেতারা এই বলে বোঝালেন, "বৃটিশ আমাদের শত্রু, একথা মানি, কিন্তু দেশটাতো আমাদের। তাই আগে দেশ রক্ষা করো, তারপর বৃটিশ তাড়ানোর কথা ভাবা যাবে।"

নেতাদের এ ধরনের কথায় আমাদের মনে খটকা লাগলো। কেননা, এর আগে নেতাদের মুখে শুনেছি 'প্রলেতারিয়ান পাথ' নীতির কথা। যার মূল কথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করা, বড় বড় কলকারখানায় ধর্মঘট করা, থানা ও সেনা শিবির ধ্বংশ করা এবং শহর গ্রামে প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে দেয়া।

পার্টির নেতৃত্ব এর আগে বোম্বের কাপড়ের কলে ধর্মঘট হয়েছে। শ্রমিকদের অনমনীয় নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত কাপড় কলের মালিকপক্ষকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। পাল্টা আঘাতও এসেছে প্রচুর। দলে দলে শ্রমিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে বহু পার্টি কর্মীকে। শেষ পর্যন্ত পার্টিকে বেআইনী পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ আজ নেতাদের মুখে এই ভিন্ন সুর কেনো?

কারণ অবশ্য ছিলো। তারিখটা ছিলো বোধ হয় ১৯৪১ সালের ২২ জুন। হঠাৎ করে ফ্যাসিস্ট হিটলার আক্রমণ করে বসলো সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার সোভিয়েত রাশিয়া। আর সে প্রেক্ষাপটেই কমিউনিস্ট পার্টি তার নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিলো। দেউলি বন্দি নিবাসে আবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ১৯৪১ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ"। কাজেই দেশের জনসাধারণকেও এগুতে হবে সেভাবেই। এই সিদ্ধান্ত থেকেই বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ জেল থেকে প্রকাশ করলেন একটি 'ইশতেহার'। তাতে বলা হলো, 'বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি রাশিয়া আক্রান্ত, সুতরাং এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ', যে করেই হোক সর্বশক্তি দিয়ে হিটলারকে রুখতে হবে। তার জন্যই আজ বৃটিশের সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন।"

সত্যি বলতে কী আন্তর্জাতিক রাজনীতি আমরা তখন অতোশতো বুঝতাম না। আমাদের কাছে তখন বৃটিশের বিরোধিতাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যা হোক নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের ধর্মঘট তুলে নিতে রাজি করালেন। রেলের সাহেবরা আমাদের কাছ থেকে বণ্ড লিখিয়ে নিলেন, যুদ্ধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে ভবিষ্যতে আমরা যেকোন এমন কাজ আর না করি! শেষমেষ বিকেলের দিকে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হলো।

কিন্তু আপস রফা হলে কী হবে? আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বৃটিশ সিংহ, আমাদের গোরা অফিসাররা' নেটিভিদের নিয়মভঙ্গের অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। তাই সেদিনকার সেই ঘটনার জের হিসেবে বেছে বেছে আমাদের কজনকে বদলি করা হলো বিভিন্ন জায়গায়। আমিও পড়ে গেলাম সেই দলে। আমাকে বদলি করা হলো কাঠিহার লোকোইয়ার্ডে।

১৯৪২-এর মাঝামাঝি সময় সেটা। বার্মার তখন পতন ঘটেছে। কোলকাতায় জোর গুজব বার্মা থেকে নাকি হাজার হাজার ভারতীয় পালিয়ে আসছে ভারতে। জাপানিরা কোলকাতায় এই এলো বলে। বাস্তবেও ঘটলো তাই। এরি মধ্যে একদিন জাপানি বিমান বহর ভারতের মূল ভূখণ্ড মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম ও কোকনাদে বোমাবর্ষণ করে বসলো। এ খবরে কোলকাতা জুড়ে শুরু হলো ত্রাস। সব জায়গায় প্রকট অস্থিরতা। কখন বিমান হামলা শুরু হয়, সেই ভাবনায় সবাই অস্থির। শহরময় সাজ সাজ রব। যখন তখন রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে মিলিটারি কনভয়। মানুষ নিজেদের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে আনাচে কানাচে। যখন তখন চলছে ব্লাক আউটের মহড়া। আমাদের নারকেলডাঙা কলোনির ছেলেরাও খুঁড়ে ফেললো অনেকগুলো ট্রেঞ্চ কলোনির ভেতরেই। নিজেরা মিলেই গড়ে তুললো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। শুধু তাই নয়, রাত জেগে জেগে তারা পাহারাও দিতে লাগলো। কলোনি জুড়ে সারারাত বাতি নিভিয়ে, জানালা বন্ধ করে রাখতে হয়। আলো জানালার বাইরে গেলেই বিপদ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে আসে।

তো এরি মধ্যে একদিন, পোঁ....ওঁ....ওঁ শব্দে সাইরেন বেজে উঠলো। হামলা শুরু হলো জাপানি বিমানের। মনে পড়ে, মাসটা ছিলো ডিসেম্বর। জাপানি বিমান হামলার ঘটনার দিন জনমনে আতঙ্ক আর আনন্দ দুই-ই সৃষ্টি করেছিলো। তার প্রমাণ পাওয়া যেতো মানুষের মুখে মুখে রচিত ছড়াগুলো থেকে। সেসব ছড়া আজ আর পুরোপুরি মনে নেই। তবে একটি ছড়ার কথা আজও ভুলতে পারিনি। ছড়াটা ছিল, যদ্দুর মনে পড়ে, এ রকমের;

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
বৃটিশ বলে বাপরে বাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই চরম সঙ্কটময় দিনগুলোতে আমাকে প্রায়ই কাঠিহার থেকে ট্রেন নিয়ে যেতে হতো আমিন গাঁয়ে। আমিন গাঁয়ের লোকোইয়ার্ডের সেই একই অবস্থা, জাপানি বিমানের সন্ত্রাস! আমিন গাঁ লোকোইয়ার্ডে দেখতাম গরুগাড়ির চাকার ওপর বিরাট বিরাট তাল গাছের গুঁড়ি রং করে বসিয়ে রাখা হয়েছে– বিমান-বিধ্বংশী কামানের নকল প্রতিরূপ ছিলো সেগুলো। বোধ করি বৃটিশদের বিমান-বিধবংশী কামানের স্বল্পতার কারণেই এমনটা করা হয়েছিলো সেদিন।

আমিন গাঁয়ে তখন পুরোদমে বিমান আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেন আমিন গাঁয়ে পৌছুলেই ইঞ্জিনের ইউরোপিয়ান ড্রাইভারদের ইঞ্জিন থেকে নেমে চলে যেতে দেখতাম। যাবার সময় তারা আমাদের বলতেন ইঞ্জিন পাহারা দিয়ে রাখতে। প্রথম প্রথম কারণটা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম, সাহেব বিমান হামলার ভয়ে আমাদের ইঞ্জিনের পাহারায় রেখে বাঙ্কারে গিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। ব্যাপারটা আমাদের ক্ষুব্ধ করে তুললো। কেন না, তখন জাপানি বিমানগুলোর প্রধান টার্গেটই ছিলো আমাদের এইসব ইঞ্জিন।

অথচ সাহেব কি না আমাদের সেই ইঞ্জিনে রেখেই পালিয়ে যান। ভাবখানা যেনো এই মরলে শালা নেটিভরাই মরবে। আমরা রাজার জাত, মরতে যাবো কোন দুঃখে।

আর একদিনের ঘটনা। আমাদের ওয়াগন্য ট্রেন আমিন গাঁয়ে পৌছুতেই অ....আঁ শব্দে সাইরেন বেজে উঠলো। আমাদের সাহেব তো সেই শব্দ শুনে ইঞ্জিন থেকে নেমেই পড়িমরি করে ছুটে পালাতে লাগলেন। আমরা রেডি হয়েই ছিলাম। দৌড়ে গিয়ে আমি আর ফার্স্ট ফায়ারম্যান গোরা সাহেবের পথ আগলে দাঁড়ালাম।
"কোথায় যাচ্ছো সাহেব?"
সাহেব আমতা আমতা করে ভাঙা বাংলায় বললেন, "চা খেয়ে আসি।"
বললাম, "টি হচ্ছে না সাহেব" ইংরেজিতে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এই বলে, 'সাহেব ইউ গো তো, আই গো।' সাহেব তবু নাছোড়বান্দা। যাবেনই। আমরাও ধনুক ভাঙা পণ করে বসেছি, আজ কিছুতেই সাহেবকে যেতে দেবো না। তাই দুজন মিলে কষে ধরলাম সাহেবকে। চ্যাঙদোলা করে নিয়ে আসতে লাগলাম ইঞ্জিনের দিকে। তবুও সাহেবের ছটফটানি থামে না। আছাড়িপিছাড়ি করতে লাগলেন। এমন সময় ডাইভ দিয়ে ছুটে এলো তিনখানা জাপানি মিৎসুবিসি বোমারু বিমান। আর ফেলবি তো ফেল, বিমান তিনটি সোজা বোমা ফেললো সেই তাল গেছে কামানের ওপর। মুহূর্তে ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো চারদিক। সাহেবের তো আতঙ্কে অজ্ঞান হওয়ার যোগাড়। ভাবলাম, বৃটিশ সিংহ, এক বোমাতেই তোমার দফা ঠাণ্ডা! যা-হোক, সে যাত্রা কোনো রকমে বেঁচে গিয়ে সাহেব সোজা আমাদের নামে হেড কোয়ার্টারে জব্বর এক রিপোর্ট হেঁকে দিলেন। এরপর থেকে সাহেব আমাদের আর সহকারী হিসেবে ইঞ্জিনে তোলেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরবঙ্গ তথা সারা বাংলাদেশে চোরাকারবারের ডিপো হিসেবে ঈশ্বরদীর একটা সুনাম সুবিদিত। সুনাম দুর্নাম যাই হোক না কেনো, ঈশ্বরদী কিন্তু সেটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশ জুড়ে দেখা দিলো চরম খাদ্যসঙ্কট। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো। এ অবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন করে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্যদ্রব্য যাতায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলো। কোলকাতা থেকে আসামের ডিরুগড় পর্যন্ত বসানো হলো পেট্রোল লাইন। যুদ্ধকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে পেট্রোলের দ্রুত সরবরাহের জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। এই লাইন দেখাশোনা করার জন্য ছিলো ইংরেজ সুপারভাইজারের দল। তাদের যাতায়াতের জন্য শিলিগুড়ি লোকালের সাথে একটি বগিই জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো। এই সময় কিছুদিনের জন্য শিলিগুড়ি লোকালের ফায়ারম্যান হিসেবে আমাকে কাজ করতে হয়। তখন দেখতাম, সাহেবরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেয়েমানুষ তুলে নিতো গাড়িতে। পেটের দায়ে এবং দালালের খপ্পড়ে পড়ে এইসব মেয়ে সাহেবদের হাতে গিয়ে পড়তো। একবার অমনি দুটো মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহেবরা তাদের নিয়ে এসে তুললো ঈশ্বরদী রেল স্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত বাবুপাড়া কলোনিতে। সে সময় বাবুপাড়া কলোনির আশপাশের বস্তিবাসীরা চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিলো। সেইসব চোরাচালানী তাদের চোরাই মালপত্র ওই দুজন মেয়ে মানুষের ঘরে নিয়ে এসে রাখতে লাগলো। সাহেবদের রক্ষিতা ভেবে, পুলিশ ভয়ে তাদের বাড়িতে কখনো হামলা করতো না। ফলে ওই দুজন মেয়ে চুটিয়ে ব্লাকের ব্যবসা জুড়ে দিলো। ক্রমে ক্রমে একসময় তারা পরিণত হলো ব্লাকের রিং লিডারে। এভাবেই সেই বাবুপাড়া কলোনির নাম বদলে হয়ে গেলো ব্ল্যাকপাড়া। সে সময়তো ঈশ্বরদীতে কোনো থানা ছিলো না। থানা ছিলো ঈশ্বরদী থেকে কয়েক মাইল উত্তরে সাড়াঘাটে। ওই থানার দারোগা বাবু আবার সাহেবদের মেয়েমানুষদের ঘাটাতে চাইতো না। একদিন ওই দুই মেয়েমানুষের ছত্রচ্ছায়ায় এ অঞ্চলে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দলও গড়ে উঠেছিলো। তারা পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে ঈশ্বরদীর মাঝামাঝি অবস্থিত ইস্তির সাঁকোর কাছে ট্রেন থামিয়ে প্রায়ই ডাকাতি করতো। এমনকি রেলওয়ের মালভর্তি ওয়াগন পর্যন্ত তারা লুট করে নিয়ে যেতো। সেই ডাকাত দলে তখন ছিল একরাম, আহমদ এবং কোরবান ডাকাতসহ আরো ক'জন।

'৪২ এর আগস্ট মাসে শুরু হলো ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড় আন্দোলন'। সবার মুখে তখন একই ধ্বনি : 'কুইট ইন্ডিয়া, 'ডু অর ডাই', 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। সারা ভারত গর্জে উঠলো। আঘাতের বদলে আঘাত, মারের বদলে মার। ভারত তখন জ্বলছে বিক্ষোভের আগুনে। বাংলা-বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বে, নাগপুর, মাদ্রাজ, আসাম কোথাও বাদ নেই। তবে তখন খেলা দেখিয়েছিলো বটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেদিনীপুর। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনে আত্মবিসর্জন দিল কত তরুণ, তার শুমার নেই। আর প্রাণ দিলেন সেকালের 'গান্ধী বুড়ি' নামে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা।

এ-বছরই হঠাৎ করে অসুখে পড়ে মারা গেলেন বাবা। যুদ্ধের ধাক্কায় বাজারদর বেড়ে যাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো তাঁকে সংসার চালানোর জন্য। বেশ কিছুদিন ধরেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিলো না তাঁর। শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকতে পারলেন না। বাবা মারা যাবার পর সংসারের দায়দায়িত্ব সব আমার ওপরই বর্তালো। আমার চাকরির বয়স তখন তিনও পেরোয়নি। যা-হোক কোনো রকমে কাটতে লাগলো দিন। বোনটার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো, বলে বড়ো একটা ফাঁড়া কেটে গিয়েছিলো।

এর মধ্যে একদিন আমার পুরনো বন্ধু আফসারের সাথে দেখা হয়ে গেলো অনেক দিন পর। আগেই বলেছি, আফসারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। আফসারের সাথে ঈশ্বরদীতে ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর ছোট বোন মরিয়মকে আবার দেখলাম। বেশ বড় হয়েছে সে। দেখতেও হয়েছে আগের চাইতে আরো সুন্দর। একদিন কথা প্রসঙ্গে আফসার বললো, 'জসীম, এবার একটা বিয়ে থা কর। সংসারী হ। যদি হাঁ বলিস, তবে আমার বৌয়ের ছোট বোনের সাথে লাগিয়ে দিতে পারি।" কিন্তু আমার পছন্দ ছিলো আফসারের ছোট বোন মরিয়মকে। আকার ইঙ্গিতে সে কথা জানিয়ে দিলাম তাকে। আফসারের মা আর বড় বোন আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমার মনোভাবের কথা শুনে খুশিই হলেন তাঁরা। কিন্তু বেঁকে বসলেন আমার শ্বশুর মশাই অর্থাৎ আফসারের বাবা, কিছুতেই না, ঐ বাউন্ডেলে, রাজনীতি করা ছেলে আমার মেয়েকে ভাত দিতে পারবে না। কিন্তু আফসারের মা ও বড় বোন অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন তাঁকে। শেষ পর্যন্ত '৪২-এর শেষের দিকেই আমার বিয়ে হলো আফসারের ছোট বোন মরিয়মের সাথে। পরবর্তীকালে আমি রাজনৈতিক কারণে যখনি জেলে গেছি কিংবা আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকেছি, আমার স্ত্রীর কষ্ট দেখে আমার শ্বশুর মশাই মন্তব্য করেছেন, 'হলো তো, আমার কথা ফললো তো? তখুনি বলেছিলাম না ঐ হতচ্ছাড়া আমার মেয়ের ভরণপোষন করতে পারবে না।"

তবে আমার স্ত্রী শত কষ্ট করলেও তার মুখ থেকে কিন্তু আমি কোনদিনও কোনো ধরনের কটু কথা শুনিনি। বরং আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সে উৎসাহই জুগিয়েছে সারাজীবন। বর্তমানে যে সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, তবু তাঁর মুখে কোনোদিন আমি হতাশার কথা শুনিনি। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতই তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে চলেছেন আজ অবধি।

ফুলবাড়ির আবদুল কাদের চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন। বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি। একসময় আন্দামানে 'কালাপানি' হয়েছিলো। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অনুশীলন' এ যোগ দিয়েছিলো। পরিচয় দিয়েছিলেন অসম সাহসিকতা আর ত্যাগের। গড়ে তুলেছিলেন নিজের এলাকায় জঙ্গী সংগঠন সাঁওতালদের এলাকায় ছিলো তার সংগঠনের মূল ভিত্তি। অবসর সময় ঘরে বসে একটু আধটু হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন। সেই সুবাদেই সাঁওতাল পল্লীতে আনাগোনা। সবাই বলতো ডাক্তার। আমাদের সেই কাদেরই সেদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন।

ট্রেন নিয়ে গেছি পার্বতীপুর। দেখি সেখানে চলছে কানাঘুষো। ব্যাপার কি? ইঞ্জিন থেমে নেমে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলাম প্লাটফরমের দিকে। ভয়ে ভয়ে গলা খাটো করে আলাপ করছে সবাই। বৃটিশের রাজত্ব, জোরে জোরে তো আর আলাপ করার উপায় নেই। কাছে গিয়ে একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, ঘটনাটা কি? জবাবে শুনলাম হিলি স্টেশন নাকি লুট করা হয়েছে। ছোটখাটো একটা বন্দুকযুদ্ধও নাকি হয়েছে কাদেরের সন্ত্রাসী দলের সাথে। অনেকে আহত হয়ে এসেছে পার্বতীপুর রেল হাসপাতালে। পরে শুনলাম পুরো ঘটনাটা। সকালবেলা। হিলি স্টেশনে তখন ভিড় বেশি নেই। টিকিট বাবু বসে আছেন অলস ভঙ্গিতে। ট্রেন আসার দেরি আছে বলে তার মধ্যে তেমন তাড়াহুড়ো করার ভাব নেই। এই অবস্থায় এক সাঁওতাল দম্পতি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলো টিকিট কাউন্টারের দিকে। বলল, হে বাবু আমাকে একটা টিকেট দে কেনে।' দেখতে দেখতে আরও অনেকে ঘিরে দাঁড়াল তার আশপাশে। তারপর হঠাৎ করেই অবাক বিস্ময়ে টিকিট বাবু লক্ষ্য করলেন, একটা কালো পিস্তলের নল তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। ব্যস্, নট নড়নচড়ন। নিমেষে সিন্দুক ভেঙে সমস্ত টাকা পয়সা লুট করে নিলো বিপ্লবীরা। স্টেশন মাস্টার বাসার জানালায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। তুলে নিলেন দোনলা বন্দুক। গুলি চালালেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে। পাল্টা জবাব এলো বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে। আহত হলেন বেশ কিছু রেলের কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ। তারপরও চলছে গোলাগুলি। সে এক ভয়াবহ তাণ্ডব। এমন সময় স্টেশন মাস্টারের ঘরের পেছনের জানালায় দেখা গেলো দুর্দান্ত টেরোরিস্ট কালী সরকারের মুখ। তিনি পিস্তল তাক করে আছেন স্টেশন মাস্টারের স্ত্রীর পিঠ লক্ষ্য করে। বললেন, "দিদি তোমার কর্তাকে বল বন্দুকটা ফেলে দিতে।" কথার শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকালেন মাস্টার সাহেব। স্ত্রীর দিকে পিস্তল তাক করার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আস্তে করে মেঝেতে রেখে দিলেন বন্দুকটি। তারপর বিপ্লবীরা নিমেষেই কোথায় হারিয়ে গেলো কেউ তাদের সন্ধান পেলো না। সেদিনকার সেই অভিযানে কালী সরকারের সাথে ছিলেন ঋষিকেশ বিনয় বোসসহ আরও অনেক বিপ্লবী। আর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথ কাদের চৌধুরী। এরপর হিলি ডাকাতি মামলায় কালী সরকার গ্রেফতার হন। পরে আন্দামানে কালাপানি হয়ে যায় তাঁর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সময় লালঝান্ডার রেল শাখার নাম ছিলো "রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন"। সভাপতি ছিলেন বীরেন দাশগুপ্ত, আর সেক্রেটারি আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। কোলকাতায় ছিলো এর কেন্দ্রীয় অফিস। মনে পড়ে, আমাদের পার্বতীপুর শাখার অফিসে জ্যোতি বসু প্রায়ই আসতেন। সংগঠনের কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। আসতেন শ্রমিক নেতা সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, ব্যারিস্টার লতিফসহ আরও অনেকে। সংগঠনের কাজে কতোবার সাক্ষাৎ হয়েছে রমেন মিত্র ও বীরেন দাশগুপ্তের সাথে। কী অদ্ভুত আচার-ব্যবহার ছিলো তাঁদের! নিমেষেই আপন করে নিতে পারতেন সবাইকে। এক সময় এসব নেতার সাথে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। নেতাদের কথায় তখন জীবনপাত করতেও কুণ্ঠিত হতাম না। সেসব নেতার নাম আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেও, যে হাজার হাজার কর্মী সেদিন সমস্ত সংগঠনের চালিকাশক্তি ছিল, তাদের নাম সবার অলক্ষ্যেই যেনো ইতিহাসের পাতা থেকে ঝরে পড়েছে।

১৯৪৬-এর কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোর তখনো কাটেনি। যুদ্ধের বর্বর প্রতিক্রিয়ায় মানুষের ঘরে ঘরে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ নামের কালো শকুনির বিষ নখর। সারা বাংলার রেল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ। যুদ্ধের জন্য নিতপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যতোটা বেড়েছে, সে পরিমাণে বাড়েনি মাগ্‌গি ভাতা। এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করেও ফল হলো না। কর্তৃপক্ষ কানে তুলো আর পিঠে যেনো কুলো দিয়ে রেখেছেন।

নিরূপায় হয়ে রেলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করার কথা ভাবতে লাগলো। তখন লাল ঝান্ডার রেল সংগঠন সবে গড়ে উঠেছে। কোথাও শক্তিশালী আবার কোথাও নেই বললেই চলে। এ রকম অবস্থায় ধর্মঘট করা যাবে কি না, সেটা যাচাই করে দেখার জন্য লালমনিরহাটে রেল শ্রমিকদের এক আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকা হলো। লালমনিরহাট তখন উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ একটা জংশন। ধর্মঘটের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে এ অঞ্চলের শ্রমিকদের ওপরই।

সে সময় সারা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো জুড়ে চলছে তেভাগা আন্দোলন। মনিকৃষ্ণ সেন, মাধব দত্ত আর কম্পরাম সিং (খাপড়া ওয়ার্ডে শহিদ) তখন তেভাগার কিংবদন্তির নায়ক। যা হোক, সম্মেলনের দিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে চমকে গেলো রেলের শ্রমিকরা। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হাজার হাজার কৃষক লালঝাণ্ডা আর লাঠি ঘাড়ে করে ছুটে আসছে সম্মেলনে যোগ দিতে। সমস্ত লালমনিরহাট শহর ছেয়ে গেল কৃষক আর শ্রমিকে। হাজারো কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো "রেল শ্রমিকদের দাবি মানতে হবে"। সেই স্লোগানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শ্রমিকরা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুললো, "তেভাগার দাবি মানতে হবে"। লাল ঝাণ্ডার কাছে শ্রমিক আর কৃষকের হৃদয় এক সূত্রে বাঁধা পড়ে গেলো। সেদিন গ্রামের কৃষকের আশ্বাসে সব ধরনের বাধাকে তুচ্ছ করে আন্দোলনের পথে এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলো রেলের শ্রমিকরা। পরবর্তীকালে দেখা গেলো, সেদিনকার সেই কৃষক শ্রমিকের মিলন সূত্র ধরে কৃষকদের তেভাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে রেলের শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করছে দলে দলে। তখন শ্রমিক কৃষক উভয়ের কণ্ঠেই একটি স্লোগান শোনা যেত : "দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও"।

১৯৪৬-এর নির্বাচনকালের একটি ঘটনা আমার মনের পাতায় এখনো গেঁথে আছে। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছিলো। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মত জনপ্রিয় দুই পার্টির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টিও অংশ নিয়েছিলো জনগণকে সংগঠিত করার কাজে। কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে যে সব প্রার্থী সেদিন দাঁড় করিয়েছিলো, তাদের মধ্যে কমরেড রজেন দাশ, কমরেড জ্যোতি বসু, কমরেড রূপনারায়ণের নাম বেশ মনে করতে পারি। জ্যোতি বসু দাঁড়িয়েছিলেন রেল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মুসলিম লীগের হুমায়ুন কবীর। পার্বতীপুর নির্বাচন কেন্দ্র। বেশ সুষ্ঠুভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। মুসলিম এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের (মুসলিম লীগের শ্রমিক সংগঠন, আমরা বলতাম দালাল পার্টি) কর্মীরা তাদের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছে। আমরা আমাদের প্রার্থীকে জেতাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছি। এমন সময় আমাদের অফিসে খবর এলো লীগঅলারা তাদের প্রাথীর বাক্সে ডাকযোগে আসা ব্যালট জোর করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সে সময় রেলের যেসব কর্মচারী হেডকোয়ার্টারের বাইরে কাজ করতো, তারা ডাকযোগে ভোট দিতে পারতো। খবর শুনে তো আমাদের পিত্তি জ্বলে গেলো। যে করেই হোক লীগঅলাদের ঠেকাতে হবে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদের। ভোট চুরির মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। ঝটপট রড লাঠি যে যা পেল তাই নিয়ে ধাওয়া করা হলো লীগঅলাদের। সে সময় লাল ঝাণ্ডার মত জঙ্গী কর্মী ওদের ছিলো না। ফলে পড়িমরি করে পিঠটান দিল ব্যাটারা। সে নির্বাচনে অবশ্য ভোট চুরির চেষ্টা করেও জিততে পারল না ওরা। আমাদের নেতা জ্যোতি বসু বিপল ভোটে জয়লাভ করলেন নির্বাচন। আজকের দিনে তো নির্বাচন মানেই ভোট ডাকাতি। এই বদ অভ্যাসটা বোধহয় উত্তরাধিকার সূত্রেই আমাদের মধ্যে এসে গেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখনো ছিলো, এখনো আছে। সে সময় দেখেছি শাসককুল যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে এই জঘন্য পথটিই বেছে নিতো। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর উগ্র ধর্মবাদী এই ঘৃণ্য পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। ফলে কোলকাতায় শুরু হলো তীব্র দাঙ্গা। এর প্রতিক্রিয়া হল সারা ভারতে। পাঞ্জাব আর নোয়াখালীতে শত শত লোক মারা গেলো। কত লোক যে গৃহহারা হলো তার শুমার নেই। এ সময় মহাত্মা গান্ধী পায়ে হেঁটে দাঙ্গা উপদ্রুত অঞ্চল সফর করলেন আর শান্তির বাণী শোনালেন সবাইকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট জিন্নাহ সাহেব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘোষণা দিলেন। মুসলিম লীগের এই দিবস পালনের কারণে প্রথমে কোলকাতাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আভাস পাওয়া গেলো। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষনার পরপরই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সব জায়গায় ফিসফাস আর চাপা স্বরের কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিলো, কিসের যেনো একটা ভয়াবহ আশঙ্কা দানা বেঁধেছে সবার মধ্যে। সাধারণত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা অংশ নেয়, সেই সব দাঙ্গাবাজ লুটেরা গোপনে গোপনে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিলো। মানুষে মানুষে বিশ্বাস আর সৌহার্দ্যের ভাব যেনো ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়ছিলো। এমনকি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষজনও একে অপরকে অবিশ্বাস করা শুরু করলেন।

সেদিন আমাদের থ্রি আপ লোকাল ট্রেন নিয়ে রানাঘাট যাবার কথা। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। বাসার সবাই আগেই ঈশ্বরদী চলে গিয়েছিলো। কাজেই পিছুটানও তেমন ছিলো না। রাস্তায় নেমেই দেখলাম, সর্বত্র একটা চাপা উত্তেজনা। মানুষজন যেনো একটা অজানা ভীতি থেকে একে অপরের মুখের দিকে পর্যন্ত চাইতে পারছে না। হন হন করে ছুটে চলেছে যে যার পথে। দলে দলে লোক নেমেছে রাস্তায়– হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারী পুরুষ শিশু। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে সেই সম্বলটুকু নিয়েই ছুটছে জান বাঁচাবার আশায়। কিন্তু কোনো কথা, কোনো শব্দ নেই কারোর মুখে। অনেক পরিবারকে দেখলাম বাকসো পেটরা আর পোটলা পুটলি নিয়ে ঠেলাগাড়িতে চেপে যাচ্ছে। আর কেউবা চেপেছে মানুষ টানা রিকশায়। সর্বত্রই একটা পালাই পালাই রব।

শিয়ালদহ স্টেশনের লোকোইয়ার্ডে গিয়ে দেখা হলো ইউনিয়নের অনেক কর্মীর সাথে। কিন্তু আগের সেই হৃদ্যতা যেনো খুঁজে পেলাম না কোথাও। হিন্দু শ্রমিকরা আমাদের দেখে যেমন দূরে দূরে থাকছে আর মুসলমানরাও আগের মত আন্তরিকতার নিয়ে তাদের সাথে মিশতে চাইছে না। এ যেনো কোনো জাদুমন্ত্রের বলে আপসে আপ সকলের মুখে কলুপ আঁটা হয়ে গেছে।

সেডের তলায় কাজ করছে লাল ঝান্ডার কয়েকজন হিন্দু কর্মী, এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে। প্রশ্ন করলাম, "দাদা একি শুনছি চারদিকে। লোকজন সব ভয়ে শহর ছাড়ছে, আপনারা কিছু জানেন নাকি?" আমার অতি পরিচিত লাল ঝাণ্ডার কর্মী, একসময় কতো আন্দোলন-সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাদের সাথে মিছিলে হেঁটেছে সেই আপনজনরাও আমাকে দেখে বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হলো, যেনো সব ঘটনার জন্য আমিই দায়ী। মনটা ভীষণ দমে গেলো। আড়াল আবডাল থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়ায়, তাদের ওপর ঘৃণায় মন রিরি করে উঠলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এলাম রানিং রুমে। রানিং রুমের অবাঙালি মুসলমান বাবুটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো আমাকে দেখেই। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললো, 'জসীম ভাইয়া এতনা খাতর মে তুম কিউ আয়া? আগার আয়া তো ট্রেন লেকার রানাঘাট যানে কে বাদ ফিন ওপাস না আনা। খবর বহুত খারাব হায়, রায়ট লাগ গিয়া।" বললাম, আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, তুমি ঠিকমতো থেকো।'

লোকোইয়ার্ডে কয়লা পানি ভর্তি করে ইঞ্জিন তৈরি হয়েই ছিলো। রানিং রুম থেকে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ইঞ্জিনে গিয়ে উঠলাম। আমার সহকারী ফায়ারম্যান আগেভাগেই এসে বসে আছে। দেখলাম তারও মুখ মলিন। বললো, 'জসীম ভাই, এ কী হলো? এর জন্য কি এতোদিন আন্দোলন করলাম?" আমার মুখে কোন উত্তরই যোগালো না। চুপচাপ বসে আমাদের ইংরেজ ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথাসময়ে আমাদের ড্রাইভার সাহেব এসে পৌঁছুলেন। দেখলাম, তিনিও চিন্তামগ্ন। এসেই প্রশ্ন করলেন, "জসীম তোমরা, ভারতীয়রা বড্ড সেন্টিমেন্টাল, এতদিন ধরে ইনডিপেনডেন্টের মুভমেন্ট করলে, অথচ ক' দিনেই সব ভুলে, নিজেরাই শুরু করলে কামড়াকামড়ি। এ তোমাদের কেমন ধারা ইউনিটি? সাহেবের প্রশ্নের কি জবাব দেবো? কোনো জবাবই খুঁজে পেলাম না।

ইঞ্জিনে রানাঘাট যাবার মত করে কয়লা ও পানি লোড করা হয়েছিলো। বগি লাগিয়ে থ্রি আপ রানাঘাট রেডি করে শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফরমে নিয়ে রাখা হলো। স্টেশনের অবস্থা আরও করুন। পঙ্গপালের মত লোক ছুটে আসছে প্লাটফরমের দিকে। সবারই বুকে পিঠে মাথায় পোটলাপুটলি, বাক্স পেটরা ইত্যাদি। আহতও আছে এদের মধ্যে প্রচুর। কারও মাথা ফেটে চৌচির। কারও হাত পা ভাঙা, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবন বাঁচাতে এর ওর সাথে ধাক্কাধাক্কি করে ছুটছে স্টেশনের দিকে। নারী ও শিশুর আর্তচিৎকার এবং আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে আছে। মাঝে মাঝেই স্টেশনের বাইরে দূর থেকে মুর্হুমুহু বন্দে মাতরম আর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি ভেসে আসছিলো। সেই সর্বগ্রাসী ধ্বনি শুনে সবার মুখে মুখে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে ভয় আর হতাশা। কোলকাতায় যেনো সহসা নেমে এসেছে রোজ কেয়ামতের মরণযজ্ঞ। এই অভিশপ্ত নগরী থেকে কোনোরকমে জান নিয়ে পালাতে পারলেই যেনো সবাই বাঁচে।

দলে দলে লোক ছুটে আসছে আর খবর দিচ্ছে, রায়ট লেগে গেছে। কোথায়? বড় বাজারে। কোথায়? পার্ক সার্কাসে। সবখানেই যেন দাঙ্গাকারী ঘাতকরা মরণ খেলায় মেতেছে। ইঞ্জিনের ওপর থেকে এসব দৃশ্য দেখছি আর হতাশায় মন ভরে উঠছে। গুটিকয় মানুষ স্বার্থের জন্য হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে এভাবে নস্যাৎ করে দিতে পারে? এ-সময় রেলওয়ের ইউরোপিয়ান কর্মকর্তারা এলেন স্টেশনে। ড্রাইভারকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "কোথাও ট্রেন থামাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, লাইন অবরোধ করে থাকলেও তাদের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেবে ট্রেন। কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না এর জন্যে।"

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে প্রায়। হঠাৎ সমস্ত প্লাটফরম জুড়ে তীব্র আর্তচিৎকার উঠলো। বুম বুম করে বোমা ফুটলো কয়েকটা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো চারদিক। দাঙ্গাকারীরা প্লাটফরমে চলে এসেছে। এলোপাতাড়ি ছুরি চালাচ্ছে জনতার ওপর। রক্তারক্তি কাণ্ড। ট্রেনের দিকে তড়িঘড়ি এগিয়ে আসছিলেন এক বৃদ্ধ। দুর্বৃত্তদের রডের আঘাতে নিমেষে দু'ফাঁক হয়ে গেলো তাঁর মাথা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। প্লাটফরমেই লুটিয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। এ জীবনে আর তাঁর রানাঘাট যাবার সৌভাগ্য হলো না।

সমস্ত বগি এরি মধ্যে মানুষে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে। তাই আমাদের ইঞ্জিনে হুটোপুটি করে উঠে এলেন কয়েকজন মহিলা। একজন মহিলার পিঠের ছুরির আঘাত থেকে কলকলিয়ে রক্ত পড়ছে। কোনো রকমে তাঁর ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়া হলো। মেয়েদের সে কী শোকাকুল কান্না। তাদের পরিবারের একজন পুরুষও বেঁচে নেই। এই অবস্থায় বাড়িঘর ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁরা। তারপরও রেহাই নেই। প্লাটফরমে দাঙ্গাকারীর সংখ্যা বেড়েছে। চারদিকে হত্যার তা-বলীলা। গার্ডের তীব্র হুইসেল শুনে আমাদের ড্রাইভার ইঞ্জিনের ভেঁপু বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলেন। পেছনে পড়ে রইলো দাঙ্গাবিধ্বস্ত শিয়ালদা স্টেশন। যে কোনো জায়গায় দাঙ্গাকারীরা বেরিকেড খাড়া করতে পারে এই আশঙ্কা থেকে আউটার সিগনাল পেরুতেই সাহেব ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। আর আমরা দুজন ফায়ারম্যান সমানে বয়লারে কয়লা মেরে চলেছি। ট্রেন যখন নারকেলডাঙা ব্রিজের কাছাকাছি এলো, দেখলাম লাইনের পাশে অসংখ্য দাঙ্গাবাজ, লাঠিসোটা আর বড় বড় তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লাল ফ্লাগ ধরে গাড়ি থামানোর চেষ্টায় রত ওরা। আর মুখে আকাশ কাঁপানো গর্জন "আল্লাহু আকবর"। বুঝলাম, মুসলমান দাঙ্গাবাজ এরা। তখন পার্ক সার্কাস আর নারকেলডাঙা এলাকার মুসলমান কসাইরা সাধারণত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ নিতো। আমাদের ড্রাইভার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমান গতিতে ট্রেন চালিয়ে গেলেন। দাঙ্গাবাজরা ছিটকে সরে গেল লাইন থেকে দূরে। তবে বুম বুম শব্দ করে কয়েকটা হাতবোমা পড়ল গাড়ির ওপর।

ঝকঝক শব্দ তুলে আমাদের ট্রেন অবিরাম ছুটে চলেছে রানাঘাট অভিমুখে। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান সবারই একমাত্র সঙ্কল্প, যেকোনোভাবেই হোক এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হবে। যতো বাঁধা আসুক, যত বিপত্তি আসুক তা অতিক্রম করতে আমরা পেছপা হবো না। ব্যারাকপুরের কাছে পল্‌তা স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছাকাছি আসতেই ড্রাইভার ট্রেনের গতি কিছুটা কমিয়ে এনেছিলেন, নিয়মানুযায়ী। বিপদটা হলো ওখানেই। দেখলাম, হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ওপর। সবার হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সূর্যের আলোয় ওদের হাতের অস্ত্রগুলো চকচক করছিলো। হাতের লাল ফ্লাগ উচিয়ে ওরা ট্রেন থামানোর চেষ্টা করলো। আমাদের ড্রাইভার নিমিষে বাড়িয়ে দিলেন ট্রেনের গতি। তবুও লাইন থেকে সরে দাঁড়ালো না দাঙ্গাকারীরা। ভয়ে আতঙ্কে আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। দাঙ্গাকারীদের সকল অবরোধ ছিন্ন করে ঝড়ের গতিতে ট্রেন ছুটে গেলো। লাইন থেকে ছিটকে পড়লো অনেকে। অনেকে নৃশংসভাবে কাটা পড়লো গাড়ির চাকায়। পল্‌তা স্টেশনে গাড়ি না থামিয়ে কেবল লাইন ক্লিয়ারের জন্য কিছুটা গতি কমিয়ে আবার বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরের স্টেশনগুলোতেই একই গতিতে আমাদের ড্রাইভার ট্রেন চালিয়ে গেলেন। এদিকে বয়লারে কয়লা ঠাসতে ঠাসতে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। এতটুকু সময়ের জন্যও বিশ্রাম পাচ্ছিলাম না। ট্রেন অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে। ছোট ছোট স্টেশনগুলোতেও দাঙ্গাকারীরা ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু ট্রেন না থামায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ট্রেনের দিকে তারা হাতবোমা ছুঁড়ে মারছে। আমাদের ট্রেন যখন দর্শনা এসে পৌছুলো, তখন দেখলাম অবস্থা বেশ ভালো। দর্শনায় ট্রেন থামতেই ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকজন ছুটে এলো। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুবকরাই আছে সেই বাহিনীতে। তারা ট্রেনের প্রতিটি বগিতে বগিতে গিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করে গেলো। জানালো, এখানে কোনো দাঙ্গার ভয় নেই। কেউ কেউ চেষ্টা করেছিলো, তবে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। তারা আরও বললো, শরণার্থীদের জন্য সেখানে শিবির খোলা হয়েছে, কেউ নামতে চাইলে এখানে নেমে পড়তে পারেন। এই যুবকদের কর্মতৎপরতা দেখে মনটা স্বস্তিতে ভরে গেলো। ভাবলাম, এখনো অনেকে আছেন যারা দেশের কথা ভাবেন, ঘৃণা করেন জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাকে। সবাই দ্বিজাতিতত্ত্বের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। কোলকাতাতেও দেখলাম, আমাদের লাল ঝান্ডার কোনো কর্মীই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ নেয়নি। তাদের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামিও অনুপস্থিত। অবশেষে, রানাঘাটে এসে রুদ্ধ হলো আমাদের ট্রেনের অবিরাম গতি। এখানকার অবস্থা আরও ভাল। দলে দলে ভলান্টিয়ার বাহিনী ছুটে এলো শরণার্থীদের জায়গামতো পৌছে দিতে। রানাঘাটের পরিবেশ দেখে মনেই হচ্ছিলো না, এই কিছুক্ষণ আগে কোলকাতার কী নরক থেকে আমরা উঠে এসেছি।

'৪৬-এর ১৬ আগস্টে ইতিহাসের জঘন্যতম যে হত্যাযজ্ঞ কোলকাতায় সংঘটিত হয়েছিলো, তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে, সেদিনকার সেই ঘটনার স্মৃতি আজও আমার মনকে মাঝে মাঝেই আলোড়িত করে। যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিনই বোধহয় এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি হৃদয়ে বহন করে যেতে হবে।

ভারতকে শকুনের মতো কাটাছেঁড়া করে নিতে চাইলেন লীগ কংগ্রেসের নেতারা। তবে এই বিভাজন সকলেই কিন্তু সেদিন মেনে নিতে পারেননি। দেশ বিভাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে তখন প্রায়ই একটি ছড়া শোনা যেতো। ছড়াটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল প্রচুর–

তেলের শিশি ভাঙল বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা

ভারত ভেঙে ভাগ করো- তার বেলা?

পাকিস্তান হবার পর

১৯৪৭ সালে ভারতকে কীভাবে কাটাছেঁড়া করে ভাগ করে নিলেন লীগ-কংগ্রেসের নেতারা, সে ইতিহাস সবারই জানা। আমরা কমিউনিস্টরা কিন্তু সেদিন ভারত কিংবা পাকিস্তানঅলাদের মতো আনন্দে অতোখানি গদোগদো হতে পারি নি। মনের কোথায় যেন ব্যথা অনুভব করতাম। হৃদয়ের কোনো গোপন কন্দর থেকে একটা হাহাকার উঠে আসতো। কেবল ধর্মের বিভেদে মানুষে মানুষে ভাগাভাগি এ রকম কোনো কিছু মেনে নিতে মন কিছুতেই সায় দিতো না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে কখনই যে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না, এটা আমরা কমিউনিস্টরা সেদিন ভালভাবেই বুঝেছিলাম। এছিলো যেনো সিংহের গুহা থেকে পালিয়ে এসে বাঘের ঘরে ঢুকে পড়ার মতোই একটা ব্যাপার। যা হোক জিন্নাহ সাহেবের সাধের পাকিস্তানে এসে আমার চাকরি হলো ঈশ্বরদীতে। নতুন দেশ– নতুন স্বপ্নে বিভোর সবাই। কিন্তু পাকিস্তানঅলাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বেশি দেরি হলো না। বৃটিশ দেশ ছাড়লেও তো তার ধড়াচুড়োটা তো ফেলে গেলো এদেশে। ঝটপট সেই বৃটিশ লেবাস গায়ে চড়িয়ে নিলেন পাকিস্তানি কর্তারা। ফলে যা হবার তা হলো পুরনো বোতলে নতুন মদ। লেবেলটা বদলে গেলো শুধু। নতুন দেশের নতুন নাগরিকরা শিগগিরই টের পেলো, পেটে খাবার থাকছে না, পরনে কাপড়ের টানাটানি। মুসলিম লীগ নেতারা অভয় দিলেন, 'আল্লা, আল্লা করো, মুসলমানের দেশ আল্লাহ আছেন সহায়। আপসে আপ মুশকিল আছান হো জায়েগা।" কিন্তু কথায় কী আর চিড়ে ভেজে? সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রেলের শ্রমিকরা। দুবেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। মাস গেলে বউয়ের পরনের কাপড় দিতে পারে না। তার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন করে খাদ্যশস্য আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এক জেলার চাল-ডাল অন্য জেলায় আসবে না। বড়ো জ্বালায় পড়া গেল।

১৯৪৯ সালের কথা। ঈশ্বরদী লোকোসেডের ফায়ারম্যান হিসেবে তখন আমার চাকরি। ঈশ্বরদীতে থেকে ট্রেন নিয়ে যাই আমুনরা, আবার ফিরে আসি। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি তখন চরম আকার ধারণ করেছে। দুর্ভিক্ষের আলামত দেখা দিতে শুরু করেছে চারদিকে। এর ওপর আছে অপশন নেয়া বিহারিদের এক বিশাল জনসংখ্যা। ঈশ্বরদীর আনাচে কানাচে বিহারিতে ঠাসা। অস্থায়ী বস্তি তুলে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। নতুন দেশের নতুন সরকার হিমশিম খাচ্ছে এ অবস্থার মোকাবেলা করতে। ডিস্ট্রিক্ট কর্ডন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেছে। ট্রেনে বাসে তারা হরহামেশাই হানা দিয়ে চেক করছে, কেউ যাতে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য পাচার করতে না পারে।

একদিন আমনুরা থেকে ট্রেন নিয়ে ফিরছি। ইঞ্জিনে বাড়ির জন্য তিন মণ চাল কিনে তুলেছি। সে সময় আমাদের রেলওয়ে রেশন সপে চালের বদল খুদ দেয়া হতো। তাই আমরা ড্রাইভার ফায়ারম্যানরা আমনুরা থেকে দু'এক মণ করে চাল কিনে নিয়ে আসতাম। তো ট্রেন যখন রাজশাহী এসে পৌছুলো, দেখি মিলিশিয়ারা চেক করছে গাড়ি। আমাদের ইঞ্জিনেও তারা এসে হানা দিয়ে বসলো। আমার তিন মণ চালই তারা নামিয়ে নিলো। এত করে বললাম, অনুনয়-বিনয় করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চাল তারা কিছুতেই ছাড়লো না। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। শাফল আর বাগ হাতে সোজা ইঞ্জিন থেকে নেমে এসে প্লাটফরমের গাছতলায় এসে বসলাম। আমার সহকারী ফায়ারম্যানও আমার দেখাদেখি ইঞ্জিন থেকে নেমে এলো। ড্রাইভার সাহেব বললেন, "জসীম, ইঞ্জিন থেকে নেমে যাচ্ছ কোথায়?" বললাম, "ট্রেন চালাবো না। আমার চাল আগে ফেরত চাই, তারপর ট্রেন চলবে।"

ড্রাইভার অনেক বোঝালেন, "পাগলামি করো না, চাকরির ক্ষতি হতে পারে। এসো কয়লা ঠাসো বয়লারে। সময় নেই। ট্রেন ছাড়তে হবে। বললাম, "কিছুতেই না, আমার চাল আগে ফেরত চাই।"

যথাসময়ে চেকিং শেষ হলে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। গার্ড সাহেব হুইসেল বাজিয়ে সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ট্রেন আর ছাড়ে না। প্যাসেঞ্জাররা ছুটে এলো, গার্ড, স্টেশন মাস্টার, ড্রাইভার সবাই এসে আমাদের দু'জনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। স্টেশন মাস্টার এসে অনেক বোঝালেন। আমার সেই একই কথা, চাল ফেরত চাই আগে। প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। আবার অনেকে আমার সমর্থনেও কথা বলতে লাগলো। ঐ ট্রেনে ব্যবসা করার জন্য অনেকেই চাল নিয়ে এসেছিলো। মিলিশিয়া ব্যাটারা সবার চালই নামিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছে। তারা একজোট হয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। এবার আমি দ্বিগুণ শক্তি পেয়ে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম তাদের উদ্দেশে। এর মধ্যে স্টেশনের বাইরের কিছু আম পাবলিকও আমার সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা চেঁচিয়ে বলছিলো, "ঠিক হয়েছে। বন্ধ করে দাও ট্রেনের চাকা। দেশের চাল দেশের মধ্যে চালান হবে, তাতে বাধা কিসের? ঠিক করেছে রেলের লোকেরা। চালাও স্ট্রাইক। আমরা আছি তোমাদের সাথে। ঠিক এই সময় কোথা থেকে জানি আমাদের প্রবীণ কমরেড খোকা রায় খবর পেয়ে ছুটে এলেন। আমার পিঠা চাপড়ে দিয়ে বললেন, "চালাও জসীম, কোনো পরোয়া নেই। পাবলিক তোমার সমর্থনে আছে। বলেই তিনি অসাধারণ এক সম্মোহনী ভাষণ দিয়ে নিমেষেই সমবেত জনতাকে উজ্জীবিত করে তুললেন।

এর মধ্যেই ঈশ্বরদী থেকে আর একটি লোকাল ট্রেন এসে পড়লো। সেই ট্রেনের ড্রাইভার-ফায়ারম্যানরাও নেমে এসে শুনলো সব কথা। তারাও আমাদের সমর্থনে ট্রেন চালানো বন্ধ রাখলো। দেখতে দেখতে প্লাটফরম লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের পক্ষে। আমনুরার দিক থেকে একটি মালগাড়িও এসে রাজশাহী স্টেশনে থামলো। স্টেশনের তিন তিনটা লাইনই জাম হয়ে গেলো। এরপর আমরা তিনটি ইঞ্জিনই 'ডক' এ নিয়ে গিয়ে আগুন ফেলে দিলাম, যাতে করে বদলি ড্রাইভার দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ গাড়ি চালাতে না পারে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। ঈশ্বরদী- আমনুরা লাইন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়লো। এদিকে ক্ষিদেয় তখন পেট চোঁ চোঁ করছে। ব্যাপারটা শুনে স্টেশনের পাশের হোটেলঅলারা যথেস্ট আদর যত্ন করে আমাদের আহারের ব্যবস্থা করলো। পয়সা দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলো না। পরে অবশ্য পয়সা না নেয়ার কারণটা অনুমান করলাম। আমরা ট্রেন চালানো বন্ধ করার ফলে স্টেশনের পাশের হোটেলগুলোতে প্রচুর বিক্রি হয়েছে। আমাদের এই জামাই আদর করার রহস্যটা সেখানেই।

গাড়ি বন্ধ করার ব্যাপার-স্যাপার-পরবর্তী ঘটনার মুখে, সত্যি বলতে কি নিজেকে বেশ বড়োসড়ো নেতা বলেই মনে হতে লাগলো। কিন্তু আমার সহকর্মী নন-বেঙ্গলি ড্রাইভার বাহাদুর খান দেখলাম, খুব ভয় পেয়ে গেছে। আমাকে বললেন, "জসীম ভাইয়া, বহুত হুয়া, আব ছোড় দো স্ট্রাইক-উস্ট্রাইক। ট্রেন চালানা।"

বললাম, "নেহি নেহি উ বাত মাত বলিয়ে। আমার ড্রাঈভার সাহেবের কিন্তু স্ট্রাইকের প্রতি যথেষ্ট সমর্থন ছিলো। তার একটাই ভয়, সবে ভারত থেকে 'অপশন' নিয়ে এখানে এসে চাকরি নিয়েছে, বাড়িঘর কিছুই নেই, বস্তিতে বাস করছে পরিবার নিয়ে। এই স্টাইকের ফলে যদি চাকরির কিছু হয়, তবে কী করে খাবে, এইসব চিন্তা থেকেই তার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর পিছুটান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সময় নন-বেঙ্গলি রেল শ্রমিকরা আমাদের যেকোনো আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন দিলেও, সামনে এগুতে পারতো না এই একটিমাত্র কারণে।

এদিকে হয়েছে কি, অনন্যোপায় হয়ে স্টেশন মাস্টার ফোন করলেন ডি.সি. সাহেবের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভ্যানভর্তি পুলিশ টুলিশ নিয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির হলেন ঘটনাস্থলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেই আমাদের ডাকলেন। তিনখানার গাড়ির ড্রাইভার ফায়ারম্যান মায় গার্ডরা গিয়ে হাজির হলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, ট্রেন চালানো বন্ধ করেছেন কেন? জানেন, আপনাদের এই হঠকারিতার জন্য সরকারের কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে?" বললাম, "অবশ্যই জানি। কিন্তু আমরা আহারের জন্য আমনুরা থেকে চাল আনছিলাম, বেতনের টাকায় কেনা চাল, চুরি করিনি, কিংবা ব্লাকের ব্যবসারও করছি না, তাহলে সেই চাল আপনার মিলিশিয়া বাহিনী নামিয়ে নিলো কেনো? ওই চাল ঘরে না নিতে পারলে আমাদের বউ বাচ্চারা সারামাস না খেয়ে থাকবে, সে কথাটাও আপনাকে ভাবতে হবে।"

ম্যাজিস্ট্রেট কিছুতেই কান দিলেন না আমাদের কথায়। সরকারি আমলার ভূমিকা নিয়ে নিজের বক্তব্যটাই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন বারবার। বললেন, ট্রেন না চালালে আপনাদের এরেস্ট করা হবে। বললাম, 'করুন, এরেস্ট করুন, চাকরি যায় যাক, জেলে যাই যাবো, তবু চাল না পেলে আমরা ট্রেন ছাড়বো না।"

অবশেষে হম্বিতম্বিতে কাজ হচ্ছে না দেখে সাহেব কিছুটা নরম হলেন। বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের চাল ফেরত দেয়া হবে, ট্রেন চালান।" বললাম, "শুধু এই চাল ফেরত দিলে চলবে না। এরপর থেকে রেলের কর্মচারীরা যাতে চাল আনতে পারে সে রকম লিখিত একটা অর্ডারও আপনাকে দিতে হবে।"

অনেক বাক-বিতণ্ডার পর ম্যাজিস্ট্রেট শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। ডিসি সাহেবের সাথে টেলিফোন আলাপ আলোচনা করে লিখিত অর্ডার দিলেন তিনি। আমরা মিলিশিয়াদের গুদাম থেকে আটক করা চাল উদ্ধার করে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বয়লারে কয়লা ঠেসে ওয়াটার কলাম থেকে পানি নিয়ে ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে। পরদিন অফিসে যেতেই বড়বাবু বললেন, "আমাদের ক'জনকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।"

মহাফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। ক'জন মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, যতোদিন না চাকরিতে জয়েন করতে পারি, ততদিন চালের ব্যবসাই চালিয়ে যাবো। তখন আমনুরায় চালের মণ পৌনে দু'টাকা। কোনো রকমে দু চার মণ চাল ঈশ্বরদীতে এনে ফেলতে পারলেই চার টাকা মণ দরে বিনা কথায় বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া রেলের পাসতো আছেই। ভাবনা কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা চাঁদা তুলে বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করে তুলে দিলো আমাদের হাতে। শুরু করলাম চালের ব্যবসা। প্রতিদিন এক ট্রিপ করে চাল আনি আর বাজারে বেচি। ভালোই চলতে লাগল সংসার।

এরি মধ্যে একদিন পাঞ্জাবি ডি.এম.ই আমাদের পাকশী রেল অফিসে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। আমরা চেম্বারে ঢুকে সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। ব্যাটা তো আমাদের দেখে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। বোমার মতো ফেটে পড়ে গাল দিয়ে উঠলেন, "ইউ ব্লাডি, স্ট্রাইক কিউ কিয়া?"

শুনে তো আমার মাথায় আগুন ধরে গেলো। ব্যাটা বলে কি? টেবিলের ওপরে ছিলো ফাইলের গাদা। তুলে নিয়ে সাহেবের মাথার ওপর দিলাম ঝেড়ে, 'সালে গালি কিউ দিয়া?" রুলার তুলে নিয়ে মাথায় ভাঙতে যাবো, সাহেবের পিয়ন এসে কোনো রকম ঠেকিয়ে দিলো। রাগে তখন আমার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। কত বৃটিশ সাহেবকে ঠেঙিয়ে এলাম, আর পাকিস্তানের পাঞ্জাবি ব্যাটা কি না বলে ব্লাডি। সাহেব তো হতভম্ব! এতবড় কাণ্ড ঘটে যাবে ভাবতেও পারেনি সে। শেষ পর্যন্ত অনেক শ্রমিক কর্মচারী জড়ো হয়ে গেলো চেম্বারের সামনে। সবারই সহানুভূতি দেখলাম আমার প্রতি। শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ অবস্থা দেখে সাহেব বোধহয় বেশিদূর এগুতে সাহস পেলো না। শুধু সাসপেনশনের মেয়াদটা গেলো বেড়ে। আমার তাতে তেমন অসুবিধা হলো না, কারণ, তখন চুটিয়ে চালের ব্যবসা করতে লেগে গেছি।

দুর্ভিক্ষের যখন চরম অবস্থা, তখন রেলওয়ে রেশন সপ থেকে শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ করা হলো খুদ। এ ছিলো আর প্রহসন। পাকিস্তানে এসে রাতারাতি রেলের শ্রমিকরা মানুষ থেকে বনে গেলো মুরগি। মুরগির খাবারের খুদই সরবরাহ করা হতে লাগলো তাদের জন্য। মুসলমানের দেশ, তাই অফিসারদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তারা পায় চাল। আর আমাদের জন্য খুদ। হায়রে পাকিস্তান। লীগ নেতারা ফতোয়া দিলেন, আল্লাহ তোর কপালে এটাই যে লিখেছে, আমাদের করার কি আছে? অচিরেই শ্রমিকরা হয়ে উঠলো বিক্ষুব্ধ। আমাদের নেতৃবৃন্দ ঘনঘন বৈঠক করতে লাগলেন শ্রমিকদের সাথে। প্রকাশ্যে তো কিছু করা যায়, কারণ শিশু রাষ্ট্র। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা, ইসলামি রাষ্ট্র! তার ওপর আছে আবার টিকটিকির দল। বৃটিশ সরকারের ট্রেনিং পাওয়া। আছে পুলিশ, বৃটিশের চাইতে এক ধাপ বড়ো। যে সে কথা নয়, পাকিস্তানি পুলিশ। তাই গোপনেই বৈঠক করতেন নেতারা। দেশ বিভাগ হলেও আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু তখনো বিভক্ত হয়নি। তখনো আমাদের কর্মকাণ্ড কোলকাতাকে ঘিরেই চলছে। আমাদের সেইসব গোপন বৈঠকে তখন আসতেন সোমনাথ লাহিড়ী, ব্যারিস্টার লতিফ, জ্যোতি বসু, ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও ভবানী সেনের মতো আরও কত নেতা! ঈশ্বরদীতে লাল ঝাণ্ডার কর্মী কমরেড সাহাবুদ্দীনের বাসায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মধ্যেই বসতো আমাদের গোপন বৈঠক। সাহাবুদ্দিনের বাসাটা ছিল লোকো কলোনির একেবারে ভেতরের দিকে। নিরিবিলি বাসা। সেই বৈঠকে একদিন সিদ্ধান্ত হলো, খুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মুরগির খাদ্য খুদ রেলের শ্রমিকরা কিছুতেই খাবে না। সাধের পাকিস্তানে বাস করে মানুষ থেকে মুরগি কিছুতেই হওয়া যাবে না। অতএব, আন্দোলন। গড়ে তোলা দুর্বার আন্দোলন। বন্ধ করে দাও রেলের চাকা। টনক নড়ুক কর্তৃপক্ষের। সিদ্ধান্তমতো চারদিকে পড়ে গেলো সাজ সাজ রব শ্রমিকদের মধ্যে। আন্দোলনের পক্ষে চলতে লাগলো মিছিল ও পথসভা ইত্যাদি প্রায় প্রতিদিনই।

১৯৪৯-এর শেষের দিকের কথা। গর্জে উঠলো লোকোসেডের শ্রমিকরা। সেড খালাসীরা হাতের গাঁইতি কোদাল ফেলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। পোর্টার, সান্টার, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার সবাই কাজ বন্ধ রেখে শরিক হলো মিছিলে। মুহূর্তখানেকের ভেতরেই সমস্ত সেড এলাকা নীরব নিথর হয়ে পড়লো। তখনো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ ছিলো। ফলে দার্জিলিং থেকে কোলকাতাগামী সব ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ঈশ্বরদী প্লাটফরমে। তখনো রেলওয়ের অধিকাংশ ড্রাইভার ছিলো ইংরেজ। পাকিস্তান সরকার ইউরোপিয়ান গ্রেডে বেতন দিতো তাদের। সেই গোরা ড্রাইভারদের ইঞ্জিন থেকে নামিয়ে দিয়ে সমস্ত কয়লা ঝেড়ে ফেলা হলো ইঞ্জিনের। খবর চাপা রইলো না। পৌঁছে গেলো কর্তৃপক্ষের কাছে। টনক নড়ল তাঁদের। পাকশী থেকে ছুটি এলন রেলের বড় বড় কর্তা। অনুরোধ উপরোধ, হুমকি ধামকি সত্ত্বেও কিছুতেই কিছু হলো না। সারাদিন ট্রেনগুলো অনড় দাঁড়িয়ে রইলো ইয়ার্ডে। প্যাসেঞ্জাররা বিরক্ত হলেও সাধারণ মানুষ আর সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারিররা কিন্তু মহাউল্লাসে ফেটে পড়লো। ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, জসীম মন্ডলরা ঠিক মারই দিয়েছে। চালের বদলে তোমরা খাওয়াবে খুদ, আর আমরা মুখ বুজে সব সহ্য করব? এ আর হচ্ছে না।

অবশেষে বিকেল পাঁচটার দিকে পাবনা থেকে কয়েক লরি রিজার্ভ ফোর্স এসে পৌঁছুলো। সে সময়কার বিপ্লবী শ্রমিক-কর্মী বাহাদুরপুরের দেলওয়ার (পরে রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে শহিদ) দৌড়ে এসে খবর দিলো, "জীসম ভাই, পালাতে হবে, পুলিশ এসে গেছে।" খবর শুনে আমি পশ্চিমে শ্রমিক কলোনির একটি বাসায় এসে আশ্রয় নিলাম। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছিলো। খাবারের কথা বলতেই শ্রমিক কলোনির অনেকেই খাবার নিয়ে হাজির হলো। আমাদের করিতকর্মা দেলওয়ার কিন্তু মাঝে মধ্যেই খোঁজখবর দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের সহায়তায় রেল কর্মকর্তারা গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছে। শোনা গেলো, স্ট্রাইকের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছে। তাই আমি রেল কলোনিতে থাকা আর নিরাপদ মনে করলাম না। সরে গেলাম আরও উত্তরে আউটার সিগনালের কাছে শ্রমিক কলোনির আর একটি বাসায়। পেছনের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘনজঙ্গল। তখন ঈশ্বরদী লোকো ইয়ার্ডের আশপাশে আজকের মতো বসতি গড়ে ওঠেনি। ইয়ার্ডের পশ্চিম পার্শ্বের মোয়াবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো ঘনজঙ্গল। দিনে দুপুরে সেখানে বাঘ ডাকতো।

নতুন এই সেন্টারে এসে আমি কিছুটা নিরাপদ বোধ করলাম। বেগতিক দেখলে পেছনের জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া যাবে। পৌঁছেই দেখি, সেখানে আগে থেকেই এসে হাজির হয়েছেন শ্রমিকনেতা বিজন সেন (রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে শহিদ)। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে দেলওয়ার এসে বললো, "জসীম ভাই, আপনারা চলে যান। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। একটু পরই পার্বতীপুর লোকাল ছেড়ে দেবে। এখানে এসে ট্রেন থেমে যাবে। আপনারা উঠে যাবেন।'

বললাম, "সে কী করে হবে! ট্রেন এখানে থামবে কেন?"

উত্তরে দেলওয়ার বললো, "আমি ফায়ারম্যানকে বলেছি, এখানে এলেই সে যেকোনো অজুহাতে ইঞ্জিনের কয়লা খোঁচানো 'কিরিচ' ফেলে দেবে। আর সেই কিরিচ তোলার জন্য ইঞ্জিন থামলেই আপনারা উঠে পড়বেন। ফায়ারম্যান আমাদের লোক, কোনো অসুবিধে হবে না।" দেলওয়ার চলে গেলো। আমি আর বিজন সেন অন্ধকারে লাইনের পাশে বসে রইলাম ট্রেনের অপেক্ষায়। ঠিক সময়ে ট্রেন এসে সত্যিই থেমে গেলো। আমরা উঠে পড়লাম ট্রেনে।

পরে শুনেছিলাম, আমাদের ট্রেনে তুলে নিতে ফায়ারম্যান সেদিন কতবড়ো ঝুঁকি কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। ট্রেন আউটার সিগনালের কাছাকাছি আসতেই সে কয়লা খোঁচানোর জন্য উঠে দাঁড়ায়। তখন কয়লার ইঞ্জিনে ছাই ঝাড়ার জন্য একটা লোহার দণ্ড (যার মাথায় দিকটা বাঁকা) রাখা হতো। এটা থাকতো সাধারণত ইঞ্জিনের বাইরে একটি হুকের সাথে। ফায়ারম্যান কয়লা খুঁচিয়ে সেই রড বা 'কিরিচ' রাখতে গিয়ে ফেলে দেয়। ফেলে দিয়ে ড্রাইভারকে বলে, 'কিরিচ' পড়ে গেছে হাত থেকে। ড্রাইভার তো রেগে আগুন। যেখানে সেখানে ট্রেন থামালে আর চাকরি থাকবে না। যা-হোক শেষমেষ ট্রেন থামলো। কিরিচ তুলে নিলো ফায়ারম্যান।

সেই ট্রেনে চেপে আমরা পৌঁছুলাম আবদুলপুর স্টেশনে। সেখান থেকে হাঁটাপথে নাটোর হয়ে বাসুদেবপুর গ্রামের হালদার পাড়ায় গিয়ে উঠলাম গভীর রাতে। হালদার পাড়ায় তখন পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি। কমরেড হাবু মিত্র তখন হালদার পাড়ার নেতৃত্বে। যা হোক তিনি আমাদের থাকার একটা ব্যবস্থা করলেন। পরদিনই হালদার পাড়া থেকে বেশ কিছু দূরে এক গ্রামের পার্টির কর্মী বৈঠক হবার কথা। কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে সে গ্রামে। পরদিন সন্ধ্যায় আমি, বিজন সেন, হাবু মিত্র এবং বেশ কিছু পার্টি কর্মী রওয়ানা হলাম কর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈঠকের উদ্দেশ্যে। পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। জন মনিষ্যির দেখা নেই। দূরে দূরে সামান্য ক'টা বাড়িঘর থাকলেও বেশির ভাগই জঙ্গলে ঢাকা। খুবই বিপদসঙ্কুল সেই জঙ্গল দিনে দুপুরে নাকি বাঘ ডাকে। কিন্তু ডাকলে কী হবে, আমরা সে পথ ধরেই চললাম। এইভাবে বেশ কিছুটা পথ এগুবার পর দুরে একটা মশালের আলো দেখে থমকে গেলাম। মশালের আলো ক্রমশ কাছে আসতেই নজরে পড়ল লোকটিকে। বিশাল বপুর এক সাঁওতাল। উদোম গা। গায়ের রং তার মিশে মিশে কালো। যেনো রাতের আঁধারের সাথে একেবারে মিশে গেছে। হাতে বিরাট একটা চকচকে বাঁশের লাঠি। এমন অন্ধকার রাতে আর এমন বিপদসঙ্কুল পথে কী কারণে লোকটি ছুটতে ছুটতে আসছিলো, পরে সেটা জানতে পারলাম। সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "বাবু এ পথে আর এগুনো যাবে না। পথে বেশ কিছুদিন ধরে বাঘের আনাগোনা বেড়েছে। গ্রামের লোক ভয়ে রাতবিরেতে বেরুচ্ছে না, আজকেও নাকি বাঘ দেখা গেছে।" সে পরামর্শ দিলো, "পাশেই একটা স্কুলঘর আছে, রাতটা ওখানে কাটিয়ে যাওয়াই বোধহয় ঠিক হবে।" এখানে বলে রাখা দরকার, আমাদের এই নতুন আগন্তুকটি সাঁওতাল পাড়ারই একজন কমরেড। রাতে আমাদের আসার খবর শুনে নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে খবর দিতে। তখনকার অশিক্ষিত কমরেডদের এমন আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত হরহামেশাই পাওয়া যেতো।

রাত বিরেতে জঙ্গলে বাঘের কথা শুনলে কার না ভয় লাগে! আমরা যে কিছুটা ভয় পেলাম না, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তাই নিরাপদ আশ্রয় স্কুলে থাকার কথা শুনে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। সেই সাঁওতাল কমরেড পথ দেখিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে তুললো। স্কুলের দরজা জানালা বলতে কিছুই নেই। পেছনেই বিশাল এক পটপানার ডোবা। খড়কুটো কুড়িয়ে এনে দরজার সামনে আগুনের কুণ্ড করে রাখা হলো। আগুন দেখলে নাকি বাঘ ভয় পায়। তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের সেই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করে অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই পাশের জঙ্গলে ডেকে উঠলো বাঘ। সেই সাথে কিছুক্ষণ পরপরই ডেকে উঠেছিলো, ফেউ। ফেউ আসলে শেয়াল। বাঘ দেখলেই ওরা ফেউ ফেউ করে ডেকে ওঠে বলে তাদের এই নামকরণ।

সারারাত তেল চকচকে বাঁশের লাঠি বাগিয়ে ধরে আমাদের পাহারা দিয়ে চললো অসম সাহসী সেই সাঁওতাল। তবে বাঘ বাবাজি খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি সেদিন। সে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর বিদেয় হয়েছিলো আপসে আপ। পরদিন সকাল হতেই আমরা বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামে গিয়ে দেখি, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। গ্রামের সবাই ভয়ে ভীষণ কাতর। চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জনও। ব্যাপার কি জানতে চাইলে তারা বললো, কয়েকদিন আগে খোঁজে খোঁজে একজন টিকটিকি অর্থাৎ সিআইডি এসেছিলো এখানে। তাকে মেরে পটপানার ভেতর গুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাখা হয়েছে। তার খোঁজে যে কোনো সময় পুলিশ এসে পড়তে পারে। তাই কদিন ধরে গ্রামের লোকজনের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এ অবস্থায় এখানে বৈঠক করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কর্মীরা বললো, 'আপনারা এসেই পড়েছেন যখন তখন গ্রামের পাশের জঙ্গলের ভেতরে একটা কালী মন্দির আছে, বিজন এলাকা, আশপাশে কেউ যায় না। জাগ্রত কালী, তাই মন্দিরের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না কেউ। ওখানে বৈঠক করলে কেমন হয়?" বিজন সেন বললেন, "ওখানেই বৈঠক করবো, চলো তোমরা।"

আমরা সেই মতোই চললাম। মন্দিরটা ঠিক পতিত নয়। এখনো পুজো-অর্চনা হয় মাঝে মধ্যে। বিজন সেন মন্দিরে ঢুকে পড়লেন। আমাদেরও ঢুকতে বললেন। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে তাঁর আনন্দ বিগলিত কণ্ঠ ভেসে এলো, "বাহ্ বৈঠকের জন্য এমন সুন্দর জায়গা আর পাবে কোথায়? চলে এসো তোমরা। আমরা ভেতরে ঢুকতেই বললেন, "একটা ছোট কাজ করতে হবে।" বললাম, "কি কাজ?" তিনি বললেন, "তোমরা সবাই মিলে একটু ধরো, বিগ্রহটা বাইরে নিয়ে গিয়ে রাখি। তারপর মিটিং সেরে আবার ওটাকে ভেতরে আনা যাবে।" ভাবলাম ব্রাহ্মণের ছেলে এই বিজন বলে কি? সবাই আপত্তি জানালো, না এতে অকল্যাণ হতে পারে। শত হলেও জাগ্রত কালী। বিজন বললেন, "রাখো তোমাদের অকল্যাণ। এসব কিছুই হবে না। আমি কালী মা'র কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।" বলেই তিনি ভক্তি গদপদভাবে মায়ের পায়ের কাছে গড় হয়ে বসে বলতে লাগলেন, "মা, মাগো! আমরা তোমার অধমসন্তান! আমাদের একটা গোপন মিটিং আছে মা, তুমি একটু বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করো, মিটিং হয়ে গেলেই তোমাকে ভেতর নিয়ে আসবো মা! তোমার সন্তানদের প্রতি যেন রুষ্ট হয়ো না মা!" কথাগুলো শেষ করেই তিনি আমাদের হুকুম করলেন, "এবার ধরো, মা রাজি হয়েছেন।" নির্দেশমতো আমরা হাতে হাতে ধরে মাকে মন্দিরের বাইরে রেখে এলাম। তারপর শুরু হলো বৈঠক। অনেক আলোচনা হলো আগামী দিনের কর্তব্য কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে। এর মধ্যেই সবার পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে ক্ষিধের জ্বালায়। বিজন বললেন, দেখি কিছু প্রসাদ মেলে কিনা।" মন্দিরের হাঁড়িকুড়ি হাতড়ে কিছু খই বাতাসা পাওয়া গেলো। কিন্তু আমাদের খেতে আপত্তি দেখে বললেন, "দাঁড়াও, তোমাদের এতই যখন আপত্তি, তখন মায়ের অনুমতিই নিয়ে আসি আগে।" আগের কায়দায় মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে বললেন, "খাও সবাই, এবারতো আপত্তি নেই?"

সেদিন প্রথম দেখলাম, সদাগম্ভীর বিজন সেনের রসিক রূপটি। তখনকার দিনে বিপ্লবীদের একটা কঠোর মনের পরিচয়ই সবাই পেয়েছে। যাঁরা হাসতে হাসতে নির্দ্বিধায় ইংরেজকে গুলি করেছেন তাদের অন্তরে যে এ রকম একটা নির্মল রসিক মানুষ লুকিয়ে থাকে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ বিপ্লবী বিজন সেন। যথাসময়ে বৈঠক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ করে কালী মূর্তিটি আবার মন্দিরের ভেতরে যথাস্থানে রেখে সেদিন আমরা আমাদের ডেরায় ফিরে এসেছিলাম।

এরি মধ্যে একদিন খবর পেলাম 'খুদ স্ট্রাইকে'র অপরাধে আমার, দেলওয়ার, হামিদ আর রুহুলসহ মোট ছ'জনের নামে হুলিয়া হয়েছে। পুলিশ আমাদের খ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় ঈশ্বরদী ফিরে যাওয়া কোনক্রমেই নিরাপদ নয়। কমরেডরা পরামর্শ দিলেন, সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে সেন্টার নিতে। সে সময় সাঁওতালের ভেতরে পার্টির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আমার গায়ের রং চেহারা আর স্বাস্থ্যের সাথে সাঁওতালদের মিল থাকায় সহজেই ওদের সাথে মিশে গেলাম। ফলে ওদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করার সময় কেউ ধরতেই পারতো না যে আমি সাঁওতাল নেই। এভাবে কাজ করতে করতেই কয়দিনের ভেতরে ওরা আমাকে আপন করে নিলো। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হতাম ওদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে। মাটির বাড়িঘর অথচ কোথাও এককণা ধুলোবালি নেই। যেন ভাত ঢেলে খাওয়া যাবে। নিকোনো উঠোনের একধারে সন্ধ্যা মালতী অথবা শিউলি গাছ থাকবেই। আমার খুব ভালো লাগতো ওদের বাড়িঘরগুলো দেখে। নিজেরা কালো বলেই সম্ভবত ওদের ভেতরে পরিচ্ছন্নতার বোধটা একটু বেশি।

ঈশ্বরদীতে সংগঠনের অবস্থার কথা চিন্তা করে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অস্থির হয়ে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। তাই প্রায় ছ'মাসের মাথায় সাঁওতাল পাড়া থেকে ঈশ্বরদী ফিরলাম একদিন। আশ্রয় নিলাম লোকোসেডে কমরেড সাহাবুদ্দিনের বাসায়। ওখান থেকেই পুলিশ একদিন আমাকে গ্রেফতার করলো। ঐ একই দিনে পুলিশ দেলওয়ারকেও গ্রেফতার করে। আমাদের গ্রেফতারের তারিখ ছিলো ২১ সেপ্টেম্বর। এই দিনটার কথা মাঝে মধ্যেই আমার মনে হয়। স্মৃতি হয়ে ভাসে চোখের সামনে। একই হাতকড়ায় আমার আর দেলওয়ারের হাত বাঁধা। বসিয়ে রাখা হয়েছে ঈশ্বরদী প্লাটফরমের ওপর। এস.পি সাহেব বারবার নাম জিগ্যেস করছে। যতোবার তিনি জিগ্যেস করেন, ততোবারই আমি আমার নাম বলছি। "আকবার" এস.পি বলেছেন, 'আপনি মিথ্যে বলছেন, আমরা জানি, আপনি জসীম মণ্ডল। খুদ স্ট্রাইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনিই।" আমি বললাম, "আপনারা ভুল করছেন, আমার নাম আকবর, আমি জসীম মণ্ডল নই।" এস.পি সাহেব এবারে আমার পকেট সার্চ করতে লেগে গেলেন। কিছুই পাওয়া গেলো না। পকেটে একটা চিঠি অবশ্য ছিলো, ধীরেন্দ্রদার লেখা। আমি সেটা এক ফাঁকে বের করে নিয়ে চিবুতে লাগলাম। এস.পি তো মহা খাপ্পা। মুখ থেকে চিঠিটা বের করে নিতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আমি গিলে ফেললাম। এই ঘটনায় এস.পি সাহেবতো রাগে রীতিমতো গড়গড় করতে করতে আমার মুখে একটা ঘুষিই মেরে বসলেন। আমার হাতে ছিল একটা হাতঘড়ি। ঘড়িটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলকাতা থেকে পাকিস্তানে চলে আসবার সময় ব্যারিস্টার লতীফ দিয়েছিলেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। আমার খুব শখের ঘড়ি ছিলো ওটা। ঘড়িটা পুলিশ কনস্টেবলরা, বলতে গেলে, ছিনিয়েই নিলো। ব্যারিস্টার লতীফের সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত গভীর। আরেকজনের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের এখানে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক-কবি গোলাম কুদ্দুস। আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি সে সময়। নাম 'মরীয়ম'। আমার স্ত্রীর নামেই নাম। যা হোক যা বলছিলাম। স্টেশনের প্লাটফরম তখন লোকে লোকারণ্য। সবাই আমাদের দেখছে নীরব দৃষ্টিতে। অনেক চেনা মুখকেও দেখলাম। দেখলাম আমাদের আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। কারো কারো চোখে জ্বলছে ক্রোধের আগুন। পারলে যেনো এক্ষুণি আমাদের ছিনিয়ে নেবে পুলিশের হাত থেকে। একসময় সবার চোখের সামনে আমাদের স্কর্ট করে পুলিশ নিয়ে তুললো প্রিজন ভ্যানে। আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো পাবনা জেলে। জেল সম্পর্কে আমার একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছিলো এর মধ্যেই। তবে সেটা ছিল বৃটিশের জেলখানা। এর আগেও কয়েকবারই কোলকাতা থাকতে জেল হাজতে গিয়েছি। তবে স্বল্প সময়ের জন্য। জেলে খাওয়া দাওয়ার চরম অব্যবস্থার কথা জানা ছিলো। তাই ঘাবড়ালাম না। রাতে আমাকে রাখা হলো হাজতিদের সাথে। সে রাতেই আমার আন্দোলনের সহকর্মী দেলওয়ারকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। তারপর থেকে আর কোনোদিন তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। আর হবে না এ জীবনে। পরে শুনেছিলাম, তাকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিলো। জামাকাপড় খুলে নিয়ে তার গায়ে পরিয়ে দেয়া হয়েছিল কয়েদিদের ডোরাকাটা পোশাক।

কারাজীবন

হাজতি ফটকের আমতলায় বসে আছে বিভিন্ন মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত বিভিন্ন কিসিমের কয়েদি। আমাকে সেখানে দেখেই নড়চড়ে বসলো সবাই। যেকোন কোনো আজব জিনিস দেখছে। একজন টিট্‌কারি মেরে বলেই বসলো, "নতুন মালের আমদানি! কেসটা কি ভাই? আর একজন কয়েদি গুটিসুটি এগিয়ে এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে জিগ্যেস করলো, ভাই সাহেব কি রেপ কেসের?" আমি বললাম, 'না মারামারির। পুলিশ ঠেঙিয়ে এসেছি। আমার জবাব শুনে তার চোখেমুখে যেনো একটা সমীহের ভাব ফুটে উঠলো। পরে শুনেছিলাম, রেপ কেসের আসামীদের ওরা খুব ঘৃণা করে। কারণ জেলের বাইরে ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবারই মা-বোন আছে। তাই মা-বোনের ইজ্জত লুটে নেয় যারা, তাদেরকে ওরা দুচোখে দেখতে পারে না। এমনকি সুযোগ পেলে পেটায় পর্যন্ত। আবার মারামারি কিংবা মার্ডার কেসের আসামিলা ওদের চোখে হিরো। বাপের ব্যাটা! তাই হাজতি ফটকে আমার কদরটা একটু বাড়লো।

প্রথম দিনটা মোটামুটি বসে বসেই কাটালাম। রাতে দেয়া হলো দুটো করে রুটি আর ডাল। সে রুটির কী চেহারা! আটার মধ্যে পোকার ছড়াছড়ি। আর দুর্গন্ধ, সে কথা বলবার নয়! তাই খেতে হলো। ভেবেছিলাম, পাকিস্তানে জেলের বুঝি কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো লক্ষণ টের পেলাম না।

ভোরবেলা ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠলো। প্রহরীদের হাঁকডাক শুরু হলো। আমাদের মেট এসে হুকুম করলো, চটপট বেরিয়ে এসো, "ফল-ইন" হতে হবে। "ফল-ইন" কথাটা পরে আমাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিলো। কারণে অকারণে দিনের মধ্যে যে কতোবার 'ফল-ইন" হতে হতো, তার ইয়ত্তা নেই।

জেলের মেটদের কথা এখানে একটু বলে রাখি, ওরা কিন্তু জেলের কর্মচারি নয়, তবু ওরা জেলের মধ্যে সর্বেসর্বা। দীর্ঘমেয়াদী কয়েদিদেরই কেবল মেট বানানো হয়। ওদের আবার চোটপাটও কম নয়। কারণ জেলের কয়েদি ঠেঙিয়ে যে মেট যত বেশি বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারবে, তার জেলের মেয়াদও ততো বেশি পরিমাণে মওকুফ হয়ে যাবে। তাই মেটরা কারণে অকারণে, কয়েদিদের ওপর মাতব্বরি ফলায়। তো সেই মেটের আদেশে আমরা যে যার ঘটি নিয়ে, প্রাতঃকর্ম সারতে লাইন ধরে পায়খানা-পেসাবখানার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে গরু ছাগলের মতোই ওই কর্মটি সারা হলো। ফিরে এসে আবার "ফল-ইন"। সেলের সামনের মাঠে। সেখানে সবার জন্য বরাদ্দ দুটো করে রুটি দেয়া হলো। তারপর জেলের ডেপুটি বাবু এলেন (তখন ডেপুটি জেলারকে এই নামেই ডাকা হতো)। আমরা গলা উচিয়ে যার যার নম্বর বসে গেলাম। তারপর ডেপুটি বাবু কাকে কি কাজ করতে হবে বলে দিতে লাগলেন যন্ত্রের মতো। আমার কাছে এসে থেমে গেলেন। পাশ থেকে জামাদার বললো, "নতুন আমদানি।"

ডেপুটি বাবু বললেন, "ঘানি"। অর্থাৎ আমার কাজ পড়ল ঘানিঘরে। জেলের ঘানি টানার কথা এতদিন মুখেই শুনেছিলাম। এবার চোখে দেখার সুযোগ হলো। ঘানিঘরে তিনখানা ঘানি চলছে অনবরত। কয়েদিরা টানছে সে ঘানি। ঘানিঘরের মেট দশাসই চেহারার এক ডাকাত। নাম গফুর। দাগী আসামী। বহু বছর ধরে জেল খেটে খেটে এমন অবস্থা হয়েছে এখন আর জেলের বারই হতে চায় না। খালাস পেলেও চুরি চামারি করে আবার জেলে ঢোকে। বদমাশের এই হাড় কয়েদিদের সবার ভাগ মেরে কেটে খেয়ে তেল চকচকে একখানা শরীর বানিয়েছে। ঘানিঘরের এক কোণে আয়েস করে বসে আছে, রাজার হালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ছিঁচকে চোর তার পা টিপছে। ঘনঘন বিড়িতে এমনভাবে টান দিচ্ছে, যেন শ্বশুরবাড়ি এসেছে ব্যাটা। আমার তো দেখে পিত্তি জ্বলে উঠলো। আমাকে দেখে বিচ্ছিরি ভাষায় মন্তব্য করল, "বনু কি নতুন আমদানি?" (গ্রামদেশে বোনের বরকে 'বনু' বলে) আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার নীরবতা তার আত্মসম্মানে আঘাত করলো বোধ করি। এগিয়ে এলো আমার কাছে। আবার মন্তব্য করলো, এই তোরা দ্যাখ আমার বনু এসেছে ঘানিঘরে ঘানি টানতে। তা বনুকেতো একটু আদরখাতির করতে হয়। নে, নে একটা বিড়ি খা। বিড়ির মোতাটি এগিয়ে ধরলো আমার দিকে। আমি বললাম, "বিড়ি আমি খাইনে।" বিড়ি জেলখানায় বড়ই দুষ্পাপ্য জিনিস। সেই বিড়ি খাব না শুনে গফুরতো রেগে আগুন। এবার চেঁচিয়ে বললো, "শালা! বসে বসে জামাই আদর নিবি? না ঘানি টনবি?" বললাম, "ঘানি আমি টানবো না।" সে বললো, "টানবি না মানে? মামার বাড়ির আব্দার নাকি। কত শালাকে এই জেলের ঘানি টানালাম, আর তুই তো কোন ছার! শুঁতোর চোটে বাপ বাপ করে টানবি, নে ওঠ শালা!" আমি এবার উঠে ঘানির কাছে এগিয়ে গেলাম। সিরাজগঞ্জের দুর্ধর্ষ ডাকাত মমতাজ, এ আতরাফে যার নামডাক আছে, সে নীরবে ঘানি টানছিলো। আমার সাথে আগে থেকেই তার আলাপ পরিচয় ছিলো। ওকে ডেকে বললাম, "মমতাজ, ঘানি ছাড়, তোরা কি গরু নাকি যে ঘানি টানবি।"

একথা শুনে গফুর আরো যেনো রেগে গেলো। বললো, 'গরু নাতো কি তোরা, অ্যাঁ? তোরা আবার মানুষ হলি কবে থেকে শুনি?" রেগে বললাম, "খেয়েদেয়ে গতরখানাতো শুয়োরের মত বানিয়েছ শালা! শুয়োর আবার কখনো মানুষ চেনে? সে তো চেনে কচু!" গফুর যেনো এবার একটু থমকালো। বলে কি লোকটা? তার মুখের ওপর এমন কথা বলার সাহস এর আগে কারো হয়নি বললো, "শালা মানুষ এসেছে রে' এই মানুষকে তো বাতি লাগিয়ে দেখতে হয়।" এবার আমার পক্ষে আর রাগ চেপে থাকা সম্ভব হলো না। পাশেই ছিলো সরষে পেটানো মুগুর, তুলে নিলাম সেটা। ছুটে গেলাম গফুরের দিকে, "শালা। মানুষ চিনিস? আয় তোকে মানুষ চেনাই?"

সব কয়েদিতো হতভম্ব! গফুরের সেই উগ্র মূর্তি এখন কোথায় গায়েব হয়ে গেছে! জোড় হাত করে বলতে লাগল, "মাফ কর ভাই! আর বলবো না। দোহাই তোর! মারিস না ভাই, মারিস না।"

"শালা মানুষ চেনো না, আজ তোকে মানুষ চিনিয়ে তবে ছাড়ব!" বলে আবার মুগুর হাতে ছুটে গেলাম তার দিকে। এবার গফুর সারা ঘানিঘর জুড়ে ভিরমি পাক শুরু করলো। আর বাপরে মারে বলে চেঁচাতে লাগলো। সবাইকে ডেকে বললাম, "এই তোরা করছিস কি? ভাঙঘানি, আজ থেকে মানুষ আর ঘানি টানবে না।" কথা শেষ করে ছুটে গিয়ে মুগুরের বাড়ি মেরে দুটো ঘানি ভেঙে ফেললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইনিজ লোহার ঘানি খুবই ভঙ্গুর! মুগুরের ঘায়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেলো মুহূর্তেই। উপায়ান্তর না দেখে এবার গফুর চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভেঙে ফেললো ঘানি, ভেঙে ফেললো।"

আমাদের ঘানিঘরের সেন্ট্রি এতোক্ষণ দূরে মাঠের মধ্যে মিষ্টি রোদে বসে একজন অল্প বয়েসী কয়েদিকে দিয়ে মাথা মালিশ করিয়ে নিচ্ছিলো। চিৎকার শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। গফুর হাউমাউ করে কেঁদেকেটে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। শুনে সেপাইটি ছুটে গিয়ে পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দিলো। আর তাই শুনে ডেপুটি বাবু, সেপাই আর জমাদার যে যেখানে ছিলো ছুটে এলো দ্রুত। সবশেষে হন্তদন্ত হয়ে এলেন জেলার চাকলাদার সাহেব। ভীষণ রাগী আর বদমেজাজি এই চাকলাদার।

ব্যাপার দেখেতো তিনি হতভম্ব! রাগে গড়গড় করতে করতে সেপাইদের হুকুম দিলেন "বানাও। বানিয়ে সোজা কর।" সাথে সাথে আমাকে পিছমোড়া করে ধরলো দুজন, আর দুজন মিলে এলোপাতাড়ি হান্টারের বাড়ি মারতে লাগলো। বুঝলাম, জেলখানায় এর নামই হলো "বানানো"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর আঘাতে আঘাতে রক্তারক্তি হয়ে গেলো। তারপর জেলার সাহেবের হুকুমে আমাকে কয়েদি ফাটকে নিয়ে এসে তোলা হলো সেলে। শুরু হলো অমানুষিক নির্যাতন। সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে রাখা হলো। পায়ের নিচে মেঝেতে পানি ঢেলে দেয়া হলো। শীতের দিন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার ওপর উদোম গা। হু হু করে কাঁপতে লাগলাম আমি। সারাটা দিনই গেলো এইভাবে। পেটে অসম্ভব ক্ষিদে। জ্বর জ্বর বোধ করতে লাগলাম। কোনো কিছু খেতে দিলো না। জেলারের নির্দেশে আমার দানাপানি বন্ধ।

সিদ্ধান্ত নিলাম, এই অমানুষিকতার প্রতিবাদ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম অনশন করবো। যতোক্ষণ না এর প্রতিকার হয়, ততোক্ষণে ছোবো না দানাপানি।

রাতের ঠাণ্ডার প্রকোপ আরো বাড়ালো। রাত দুটোর দিকে বদল হলো সেন্ট্রিদের ডিউটি। নতুন সেন্ট্রি এলো। অল্প বয়েসী একজন যুবক। ছেলেটা দেখলাম খুব ভালো। জেলখানার এই অমানবিক পরিবেশে তাকে ঠিক মানায় না। আমার এই অবস্থা দেখে তার বোধহয় খারাপই লাগছিলো। তাই সেলের দরজায় মুখ লাগিয়ে আস্তে করে বললো, 'আপনি তো কমিউনিস্ট। আপনাকে আমি চিনি। জেলের বাইরে যখন ডিউটি ছিল, তখন শ্রমিক সভায় আপনার বক্তৃতা আমি শুনেছি। এ অবস্থায় থাকলে শীতে আপনি তো মারা যাবেন। এক কাজ করি, দেখি আপনার জন্য কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।" বললাম, "খবরদার! ওটি করতে যেও না। এটাই আমার শাস্তি। খামোকো আমার উপকার করতে গেলে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজে বিপদে পড়বে। জেলার ব্যাটা জানতে পারলে চাকরি যাবে তোমার। তার চেয়ে কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া আনতে পারো কিনা দেখ। মেঝেটা মুছে নিলেই ঠাণ্ডা কম লাগবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সেপাইটা অনেকগুলো ছেঁড়া কাপড় এনে হাজির হলো। মেঝেটা ভালো করে মুছে নিয়ে সেই ছেঁড়া কাপড়গুলোই পায়ের নিচে দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। এ অবস্থাতেই একসময় ভোর হয়ে এলো।

সকালে উঠে দেখলাম, আমার পাশের তিন নম্বর সেলে রয়েছে চাটমোহরের সোনাই মল্লিক। সেকালের দুর্ধর্ষ ডাকাত। আর পাঁচ নম্বর সেলে বদ্ধ এক উন্মাদ। খুনের আসামি। দেখলাম এককালের নামকরা ডাকাত সোনাই মল্লিকের আমূল পরিবর্তন হয়েছে জেলে এসে। সবসময়ই তসবিহ তেলাওয়াত করছে। তার হাতের তসবিহ আবার সন্ধ্যামালতী ফুলের বিচি দিয়ে তৈরি। জেলের ফটকের ভেতরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে করতে অনেকের মনেই এরকম ধর্মভাব জাগাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই অনেককেই দেখতাম তখন তসবিহ বানানোর জন্য বাগান থেকে সন্ধ্যামালতী ফুলের বিচি সংগ্রহ করতে। সেই সোনাই মল্লিক আমাকেও উপদেশ দিলো, "বাবাজি, আল্লার নাম করো! মুশকিল আছান হবে।" বললাম, "চাচা ওরা আমাকে যে রকমভাবে বেআব্রু অবস্থা করেছে, তাতে আল্লাহর নামও যে নেবার জো নেই, তার চেয়ে আপনি আমার একটা উপকার করলে ভালো হয়। বাগান থেকে কয়টা পাথর এনে ছুঁড়ে দেন। তাই দিয়ে গা গরম করা যাবে, শীতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লাম।" সোনাই মল্লিক তাই করলো। বাগান থেকে মেটকে দিয়ে কয়েকটি পাথর আনিয়ে দিলো। আমি দুই হাতে পাথর লোফালুফি করে শরীরটা গরম রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সকালে খাবার এলো, সেই পোকাঅলা আটার দুর্গন্ধময় দু'টুকরো রুটি। আমি সে রুটি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বাইরে। দুপুরের খাবার এলো দু'ছটাক চালের ভাত আর সামান্য ডাল। পচা চালের ভাত সামনে আনা মাত্র গন্ধ বেরুতে লাগলো। সে খাবারও ফিরিয়ে দিলাম। সে সময় জেলে এমনি সব খাবার দেয়া হতো, যা খেলে সুস্থ মানুষও রোগী বনে যেতো। তার ওপর ছিলো তেঁতুল আর টক বেগুনের অম্বল। রক্ত পানি করার মহৌষধ। বৃটিশরা জেলে এ নিয়মগুলো চালু করেছিলো, বন্দিদের, বিশেষ করে রাজবন্দিদের তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবার জন্যই। পাকিস্তানঅলারা বৃটিশের কাছ থেকে নিয়মগুলো পেয়েছিলো উত্তরাধিকার সুত্রে। সে সময় দেখেছি, দীর্ঘদিন ধরে জেলখাটা আসামিরা অমানুষিক পরিশ্রম আর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে টিবি বাধিয়ে বসতো। জেল থেকে মুক্তি পেলেও এই কালব্যাধির হাত থেকে কারুরই মুক্তি ছিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলের এহেন খাবার সম্পর্কে তখন কয়েদিরা একটা গানও বেঁধেছিলো। গানটা আজও আমার মনে আছে–

জেলখানাতে সুখে আছি
ভাইরে ভাই....
খানাপিনার বিরাট ঘটা।
বিরাট আয়োজন,
এককাঁঠা ভাত, এককাঁঠা ডাল
তাতেই খুশি মন
আবার প্রেম সাগরে বান ডেকে যায়
টক বেগুনের অম্বলে–

জেলের খাবার সম্পর্কে এ রকম তীব্র তীক্ষ্ণ আর কোনো গানে বা কবিতায় শুনেছি বলে মনে পড়ে না। জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা এই উচ্চারণরণ।

সারাদিন অভুক্ত রইলাম। খাবার ফিরিয়ে দিলাম। সবাই জেনে গেলো চার নম্বর সেলের কয়েদি জসীম মণ্ডল অনশন করেছে। দিন গড়িয়ে রাত এলো, আমাকে রাখা হয়েছে তেমনি বিবস্ত্র অবস্থায়। রাত দুটো আবার সেই যুবক সেপাইটির ডিউটি। আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করলো খাওয়ার জন্য। বললো, "রাতে কিছু খেলে তো আর কেউ দেখতে আসছে না। আপনাকে পাউরুটি এনে দিই, খেয়ে নিন। কেউতো জানছে না যে, আপনি মুখে কিছু তুলেছেন।" বললাম, "তা হয় না। কমিউনিস্টরা জীবন গেলেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আমি কমিউনিস্ট, আমার এক সিদ্ধান্ত, যতোক্ষণ আমাকে এ অবস্থা রাখা হবে, ততোক্ষণ কিছু মুখে তুলবো না।"

তাই ভাবি, তখনকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কী পরিমাণ নৈতিকতা ছিলো আর আজ? এই তো সেদিনকার কথা। '৭৩-৭৪ এর দিকে জেলখানায় দেখতাম জাসদের নেতারা অনশন করতেন, আর রাতের বেলা সবার অলক্ষ্যে চিড়ে গুড় ভিজিয়ে পেট পুরে আহার করতেন। দিনের বেলা লোকজনদের দেখাতেন, তার অনড় অনশন তখনো চলছে।

আমার 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' এর খবরটা আর চাপা থাকলো না। শেষ পর্যন্ত তা পৌঁছে গেলো কর্তৃপক্ষের কানে। জেল কর্তৃপক্ষ হাঙ্গার স্ট্রাইককে বড়ই ভয় করতো সেইকালে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জেলার চাকলাদার। প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ, তারপর হুমকি-ধামকি। কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অটল। বললাম, 'অনশন কিছুতেই ভাঙবো না। আপনি ডি.সি সাহেবকে খবর পাঠান, তার সাথে কথা বলতে চাই।" অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে জেলার সাহেব খবর পাঠালেন ডিসি সাহেবকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসি সাহেব এলেন পরদিনই সকালে। সেলের সামনে এসেই আমার বেআব্রু অবস্থা দেখে ছিটকে সরে গেলেন আড়ালে। যেন ভূত দেখেছেন। তারপর আড়াল থেকেই জিগ্যেস করলেন, 'আপনার এ অবস্থা কে করলো? কাপড় চোপড় কোথায়? উলঙ্গ হয়ে আছেন কেন?" বললাম, "দয়া করে আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়ান, সব বলছি। আপনাদের সাধের পাকিস্তানের জেলে আমাকে কীভাবে রাখা হয়েছে, স্বচক্ষে দেখবেন না? তিনি বললেন, "আপনি কাপড় পরুন আগে, তারপর সব শুনছি।" বললাম, "আপনার জেলার সাহেবের নির্দেশে আমার সব পোশাক খুলে নেয়া হয়েছে।'

আমার কথা শুনেতো ডিসি সাহেব মহাখাপ্পা! তখন তখুনি জেলারকে কী ধমকানি। "আপনাকে জেলার বানিয়েছে কে? বিবেকবুদ্ধি কিছু আছে আপনার? আমি আজই আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব। কয়েদিদের সাথে একমন পশুর মতো আচরণ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?" জেলার তো তখন মেনি বেড়াল। মিউমিউ করে কেবল বললেন, "এই কয়েদি স্যার ঘানিঘরের দুটো ঘানি ভেঙে ফেলেছে।" ধমকে উঠলেন ডিসি সাহেব, 'ঘানি কি আপনার বাপের, না সরকারের? তার জন্য এমন অমানবিক কারবার করতে হবে? যত্তোসব!"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাপড় চোপড় এনে হাজির করা হলো। ডিসি সাহেব অনুরোধ করলেন কাপড় পরে নেয়ার জন্য। বললাম, 'কাপড় পরতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমার কিছু কথা শুনতে হবে।" বললেন, "সব শুনবো, আগে কাপড় পরে নিন।"

AMARBOI.COM

কাপড় পরা হলে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "বলো তোমার কি বলার আছে?" বললাম, "প্রথম কথা, আপনার জেলে যে খাবার দেয়া হয়, তাতে কয়েদিদের পেট ভরে না। যে আটার রুটি দেয়া হয় তাতে পোকা, আর চালের ভাতে ভীষণ দুর্গন্ধ। এসব অখাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে। বাগানে গিয়ে দেখুন বেগুন টমেটো কিছুই নেই। ক্ষিদের জ্বালায় কয়েদিরা সব খেয়ে ফেলেছে। খাবার পরিমাণ বাড়াতে হবে।" ডিসি সাহেব কথা দিলেন সব ব্যবস্থা হবে। বললাম, "আর একটা কথা, ঘানি আমরা টানতে পারবো না। ঘানি টানবে গরু, আমরা যে মানুষ, ব্যাপারটা স্বীকার করেন তো? কাজেই মানুষ ঘানি টানবে না। আর যখন তখন, কারণে অকারণে ঘুঘু করে রাখা চলবে না (তখন কয়েকদিদের সাজা দেয়া হতো ঘুঘু বানিয়ে রেখে। ঘুঘু হল হাঁটুর নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কান ধরে বসে থাকা)।"

ডিসি সাহেব সবকিছু শুনে বললেন, "সব ব্যবস্থা হবে। আপনি এখন কিছু খেয়ে নিন। আমি আপনার খাওয়া দেখে যেতে চাই।" ডাক্তার সাহেব সঙ্গেই ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ডাবের পানি আর গ্লুকাজ খেতে দিলেন তিনি। আমি অনশন ভঙ্গ করলে ডিসি সাহেব জেলারকে বললেন, 'যতদিন ওর শরীর সুস্থ না হয়, ততদিন ওকে হাসপাতালে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। ভবিষ্যতে যেন এমন অঘটন না ঘটে আর।"

এরপর আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো হাসপাতালে। হাসপাতালে মোটামুটি আরামেই দিন কাটছে। খাওয়া-দাওয়াও ভালো। তবে সবচাইতে যে সুবিধাটা পাচ্ছি, তা হলো অবাধ মেলামেশার সুযোগ। আর এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে গেলো হাসপাতালে। কাজকর্ম নেই। দিনরাত আড্ডা দিচ্ছি অন্যান্য রাজবন্দির সাথে। প্রথম জেলে এসে অনশন করার ফলে জামাদার, মেট, এমনকি ডেপুটি বাবুও কিছুটা সমীহ করে চলে এখন। হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবও আমার ব্যাপারে মোটামুটি সহানুভূতিশীল। সহজে রিলিজ দিলেন না তিনি। যদিও আমার শরীর এখন পুরোপুরি সুস্থ। হয়তো বা জেলার সাহেবের ইঙ্গিতেই আমাকে রাখা হয়েছে এখানে। সেলে পাঠালে আবার কি গণ্ডগোল বাঁধিয়ে ফেলবো এই আশঙ্কা থেকে। এরি মধ্যে প্রায় পাঁচ ছ'মাস গত হয়েছে। জেল সম্পর্কে আমার এখন একটা মোটামুটি ধারণাও জন্মেছে।

একদিন সকালে উঠে বাগানে হাঁটছি। লক্ষ্য করলাম, কয়েদি থেকে শুরু করে কর্মচারী পর্যন্ত সবার মুখই যেন থমথমে করছে। এখানে-সেখানে কয়েদিদের মধ্যে নিচু স্বরে কানাঘুষো। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। গার্ডদেরকেও আজ একটু বেশি সতর্ক বলে মনে হচ্ছে। এক-পা দুপা করে এগিয়ে গেলাম কয়েদিদের কাছে। অনেকেই বাগানে কাজ করছিলো। তাদের মধ্যেই একজনকে জিগ্যেস করলাম, "কি ব্যাপার, কিছু হয়েছে নাকি? চারদিকে দেখছি থমথমে ভাব। তোমরা কিছু জানো নাকি?" জবাবে কয়েদিটি অসম্ভব সতর্কতার সাথে চারপাশ দেখে নিয়ে আস্তে করে বললো, "রাজশাহী জেলে কয়েদিদের ওপর নাকি গুলি চালানো হয়েছে। ক'জন মারা গেছে, তা অবশ্য জানা যাচ্ছে না।"

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমি। বললাম, "কোত্থেকে শুনলে? কে খবর দিলো?" কথাটা শোনামাত্র উত্তরে সে জানালো, অফিসে আলাপ হচ্ছিলো মেট কয়েদিরা নাকি তাই শুনেছে। আমার কেমন যেনো ভয় ভয় করতে লাগলো। দেলওয়ার ও প্রসাদ রায় (বর্তমানে পাবনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা) রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে রয়েছে। তাদের যদি কিছু হয়ে থাকে? গোপনে সারাদিন খোঁজখবর করেও আহত বা নিহত কারুরই নাম সংগ্রহ করতে পারলাম না। চিন্তায় রাতে ঘুম হলো না। আমার ঘনিষ্ঠ দুই সহকর্মীর বিপদাশঙ্কায় মনটা হঠাৎই হাহাকার করে উঠলো। তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, আমার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী দেলওয়ারের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে রাজশাহী জেলের পশুরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় ছ'মাস পাবনা জেলে কাটানোর পর আমাকে বদলি করা হলো রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে। রাজশাহী জেলের সুপার তখন বিল নামের এক ইংরেজ। বৃটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরও এই কুলাঙ্গারটিকে রেখে গিয়েছিলো। বোধ করি শেষ হত্যাযজ্ঞটি চালানোর জন্যই। অসম্ভব নৃশংস আর বদরাগী ছিলেন এই বিল। এর আগে ঢাকা ও বহরমপুর জেলে কয়েদিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হাত পাকিয়ে ছিলেন তিনি। নরপশু ছাড়া অন্য আর কোনো বিশেষণেই মানায় না তাকে।

রাজশাহী জেলে এসে দেখলাম সবকিছু কেমন সুমসাম। ক'দিন আগেই যে এখানে গুলি হয়েছে তার কোনো চিহ্ন বাহ্যিকভাবে গোচরীভূত নয়। যদিও কয়েদিদের মধ্যে সেই ভীতিকর ভাবটি এখনো লক্ষণীয়। গোপনে গোপনে জানতে চেষ্টা করলাম, ক'জন মরেছে, কী সমাচার ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমাদের সেল পরিষ্কার করতে আসতো এক মেথর। তাকেও জিগ্যেস করে কিছু জানতে পারলাম না। গুলি হয়েছিলো শুধু এটুকুই বলতে পারল সে। ক'জন কিংবা কারা মারা গেছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এখানে এসেই দেখা হয়ে গেলো এককালের টেরোরিস্ট এবং পরে দুর্ধর্ষ ডাকাতে রূপান্তরিত খুলনার মাধবের সাথে। তার কাছেই শুনলাম সব। ঘটনাটি এরকমের মুসলিম লীগ সরকার আসার পর থেকেই জেলের ভেতরে রাজবন্দিদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দাবিতে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁদের ঠোকাঠুকি লেগেই ছিলো। শুধু রাজশাহী জেলে নয় অন্যান্য জেলেও রাজবন্দিরা সোচ্চার হচ্ছিলো ক্রমে ক্রমে। পাশাপাশি জেল কর্তৃপক্ষও নৃশংস দমননীতি ও পীড়ন চালাচ্ছিলো রাজবন্দিদের ওপর। বৃটিশ আমল থেকে রাজবন্দি হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা তারা পেয়ে আসছিলো, মুসলিম লীগ সরকার সেটুকুও হরণ করে নিলো শেষ পর্যন্ত। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো রাজবন্দিরা।

১৯৫০ সালের ২৩ এপ্রিল। রাজশাহী জেলের সুপার রাজবন্দিদের সাথে আলাপ করার অজুহাতে খাপড়া ওয়ার্ডে ঢুকলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তুমূল বাক বিতণ্ডা শুরু হলো।

বিল সাহেবও এটাই চাইছিলেন। এই বিতণ্ডাকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে এলেন। একসময় আলোচনা বন্ধ করে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে তালা লাগালেন সেলের দরজায়। আর সেপাইদের হুকুম দিলেন গুলি চালাতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেপাইরা প্রস্তুতই ছিলো। তারা সেলের শিকের ভেতর দিয়ে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে নির্মমভাবে গুলি চালালো অসহায় রাজবন্দিদের দিকে তাক করে। শোনা যায়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই নাকি বিল সাহেব এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটাতে সাহস পেয়েছিলেন। মুসলিমের লীগের রাজত্ব শেষ ইংরেজ জেল সুপার বিল সেদিন এভাবেই চরিতার্থ করেছিলেন তার প্রতিহিংসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজশাহী সেন্টাল জেলের খাপড়া ওয়ার্ড আজও বহন করছে সাতজন বীর শহিদের স্মৃতি। তাঁরা হলেন, কম্পরাম সিং, দেলওয়ার, বিজন সেন, আনোয়ার, সুধীন ধর, সুখেন্দু ভট্টাচার্য এবং হানিফ। এছাড়াও খাপড়া ওয়ার্ডে সেদিনকার নির্মম গুলিবর্ষণে আহত হয়েছিলেন পাবনার প্রসাদ রায় (প্রসাদ রায়ের পায়ে গুলি লেগেছিলো। গুলিটা এখনো খাপড়া ওয়ার্ডের স্মৃতি হিসেবে তিনি শরীরের ভেতরেই পুষে রেখেছেন। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক যন্ত্রণা হয়, তবু অপারেশন করতে রাজি হন না)। আর একজন সেদিন আহত হয়েছিলেন। তিনি নুরুন্নবী চৌধুরী তার দুটো পা-ই কেটে বাদ দিতে হয়েছিলো।

দেলওয়ারের মৃত্যু সংবাদ শুনে মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। কেবলি মনে পড়তে লাগলো ঈশ্বরদীর সেই খুদ স্টাইকের দিনগুলোর কথা। নিজের ধরা পড়ার ভয় তুচ্ছ করে আমাকে সেদিন ও পালাতে সাহায্য করেছিলো। সদা হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল সেই দেলওয়ার আজ নেই। মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আর কোনদিনও লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে, বুক চিতিয়ে মিছিলের সামনে হাঁটবে না। ও সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রাম আর সব ধরনের স্বার্থ দ্বন্দ্বের বাইরে চলে গেছে। চিরকালের জন্য।

সেদিন সারাটা রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল চোখের পানি ফেলেছিলাম। মাধবের কাছেই শুনলাম, নাচোলের সংগ্রামী নেত্রী ইলা মিত্রও নাকি রাজশাহী জেলে আছেন। মনে পড়লো আমরা যখন ফেরার হয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন তাঁর নামেও ওয়ারেন্ট ছিলো। একদিন দেখলাম, ইলা মিত্রকে বিচারের জন্য কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগে পিছে অসংখ্য পুলিশ। মাঝখানে রাজরানীর মতো উন্নত শির চলেছেন তিনি। আগের মত স্বাস্থ্য আর নেই। কেমন যেনো রোগাটে হয়ে গেছেন। বুঝলাম, যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে তাঁর ওপর। কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল ইলার, আর সে কী অফুরন্ত প্রাণশক্তি। গায়ের রং ছিলো কালো। সুঠাম স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর শাশুড়ি তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'শ্যামা' বলে।

ইলা মিত্রকে যেদিন বিচারের জন্য জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো, সেদিন জেলের সব প্রহরী আর সমস্ত পুলিশ বিভাগ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। না জানি কখন কী ঘটিয়ে বসেন ইলা। জেলখানা থেকে কোর্ট পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মানুষের ঢল নামতো। শয়ে শয়ে সাঁওতাল ছুটে আসতো গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা, সাঁওতালদের রানীমা, ইলাকে দূর থেকে একনজর দেখে যেতো তারা। সবার উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে পুলিশ কর্ডনের ভেতরেই দৃপ্ত পদভারে হেঁটে যেতেন অগ্নিকন্যা ইলা মিত্র। কিংবদন্তির নায়িকা ইলা মিত্র সম্পর্কে কতো কথাই না তখন লোকের মুখে মুখে। লোমহর্ষক সেই সব কাহিনী আজও নাচাল এলাকায় লোকজনের মুখে মুখে ফেরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজেও অনেক সময় সংগঠনের কাজে ইলা মিত্রের সাথে সাঁওতাল পাড়ায় গেছি। সেখানে ইলার কী সমাদর! যেনো স্বর্গীয় কোন দেবী এসে হাজির হয়েছেন সাঁওতাল পরগনায়। সাঁওতালরা তাঁকে দেখলেই গড় হয়ে প্রণাম করতো। মুখের কথাতো দূরের কথা, তাঁর চোখের সামান্য ইশারাতেই শত শত সাঁওতাল নারী-পুরুষ হাসতে হাসতে জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। একবারের একটা ঘটনা বলি। ইলা মিত্র তখন নাচোলের সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত। সে সময়ই একদিন আমাদের গোপন মিটিং বসেছে। আলোচনা চলছে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। রংপুরের বিরাট এলাকা জুড়ে তখন চলছে তেভাগা আন্দোলন। বৃটিশদের মতো পাক সরকারও দমননীতির পথ ধরেছে। মনিকৃষ্ণ সেন, বিজন সেন আর কমনীয় দাশগুপ্তের মতো বাঘা বাঘা সব পার্টিনেতা উপস্থিত। আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া পার্টির ওপর যেভাবে দমননীতি চলছে, তাতে করে নেতা কর্মীদের আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে গেলেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই পরিবার পরিজন রয়েছে। তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থার জন্যও প্রয়োজন অর্থের। অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে? সিদ্ধান্ত হলো প্রতিটি কর্মী যার যার আছে, সোনা রূপার গহনা সবই দান করবে পার্টিকে। ইলা মিত্র বললেন, তাই সই।"

জমিদারের গৃহবধূ তিনি। স্বামী রমেন মিত্র নিষ্ঠাবান পার্টি কর্মী। তিনি গহনা দেবেন না তো দেবেন কে? চিন্তা করলেন, নিজের গহনাগুলো তো দেবেনই, শাশুড়ির গুলো কীভাবে দেয়া যায়, সে কথাও। শাশুড়ি তো আর স্বেচ্ছায় দিতে রাজি হবেন না। অন্যভাবে নিতে হবে। এই "অন্যভাবে" সম্পর্কে ইলার মাথায় উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা নেই। উপায় একটা বেরিয়ে গেলো, শাশুড়িকে গিয়ে অনুনয় বিনয় করে বললেন, "মা, অনেক দিন তো মেয়ের বাড়ি যান না। মেয়েটাকে এবার দেখতে যেতে হয় না? কেমন মা আপনি মেয়ের জন্য প্রাণ পোড়ে না?"

শাশুড়ি বললেন, "দেখতে তো ইচ্ছে করে মা, কিন্তু আমি গেলে সংসার দেখবে কে?" ইলা বললেন, কোনো, আমি আছি কি করতে? আপনি কালই যান, আমি ঘর-সংসার দেখবো কখন।"

পরদিনই শাশুড়ি গেলেন মেয়ের বাড়ি। ইলা এই সুযোগেই ছিলেন। গভীর রাতে শাবল দিয়ে দমাদম শাশুড়ির সিন্দুক ভেঙে ফেললেন। সারিয়ে ফেললেন সমস্ত গহনা। তারপর নিজের কাপড় চোপড়ে মাটি মাখিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ঘরের সব জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড করে চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে তুললেন, তোমরা কে কোথায় আছো, বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকাত সব নিয়ে গেলো" তার সে আর্তচিৎকারে পাড়াপ্রতিবেশী, গ্রামের সব লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে হাজির। এসে দেখলো তার সব শেষ! ডাকাত সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। পরদিনই খবর পেয়ে শাশুড়ি পড়িমরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ছুটে এলেন। পাড়ার লোক আগ বাড়িয়ে খবর দিলো, "আপনি আজ আসছেন মা। এদিকে যে গতরাতে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেলো।" শাশুড়ি সবই বুঝলেন। ইলার প্রকৃতি তো তাঁর জানা। একটুও আশ্চর্য না হয়ে বললেন, "ডাকাতি হয়েছে আমার বাড়িতে, ইলা উপস্থিত থাকতে! ডাকাতের এতো সাহস হবে কি করে? ও গহনা ইলাই নিয়েছে। ওই তো বড় ডাকাত।"

শাশুড়ি ইলাকে আপন মেয়ের মতোই আদর স্নেহ করতেন। তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, ইলা গহনা চুরি করে সংগঠনকে দান করেছে। তারপরও সেদিন ইলাকে একটা কটু কথাও বলেননি তিনি।

ইলা ছিলেন বাড়ির আদুরে বউ। মেয়েমানুষ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে বেড়ালেও বাড়ির কেউ তাঁকে বাধা দিতেন না। ইলার গায়ে ছিল অসুরের মতো শক্তি। গাছে ওঠা, নদী সাতরানো, মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়া– এসবই তাঁর কাছে ছিলো নস্যি বরাবর। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সাথে ছায়ার মতো থাকতো দুর্ধর্ষ ও সাহসী কর্মী আজাহার। এককালের টেরোরিস্ট আজাহার ছিলো ইলা মিত্রের দেহরক্ষী। কিন্তু দু:খের বিষয়, এই বিশ্বস্ত কর্মীই পরবর্তীকালে আর্থিক অনটনের কারণে ডি.আই.বি ওয়াচারের ঘৃণ্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

আর একদিনের ঘটনা। সম্ভবত নাচোল সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কারই এটা। ইলা মিত্র তখন ফেরারি জীবনযাপন করছেন। এই সময় একদিন একটা মিটিং ছিলো নবাবগঞ্জের দিকের এক গ্রামের ভেতরে। হঠাৎ করে খবর এলো, পুলিশ নাকি কোনোভাবে জানতে পেয়েছে এই মিটিং-এর কথা। যখন-তখন এসে হাজির হতে পারে। তাই এক্ষুনি পালানো দরকার। কর্মীরা যে-যেখানে পারলো রাতের আঁধারে আত্মগোপন করলো। ইলা মিত্রসহ আমরা কয়েজন হাঁটতে হাঁটতে মহানন্দা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। আশা ছিলো, ঘাটে হয়তো কোনো নৌকা পাওয়া যাবে। কিন্তু বৃথা আশা। বর্ষার দুর্যোগের রাত। ঘাটে কোনো নৌকো নেই। কী করা যায়?

ইলা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। পরনের কাপড় গাছ-কোমর করে জড়িয়ে প্রস্তুত হলেন। আমরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কি ব্যাপার?" ইলা বললেন, "উপায় নেই। নদী সাঁতরাতে হবে।" আমাদেরতো গায়ে জ্বর এসে গেলো তার কথা শুনে। বললাম, "ইলা বলেন কি? ভাদ্রমাসের ভরা নদী, তার ওপর তীব্র স্রোত।" ইলা নাছোড়। বললেন, "আপনারা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে সাঁতরাবেন, যেনো জড়াজড়ি করে না মরি।" বলেই দিলে ঝাঁপ। আমরাও ঝাপিয়ে পড়লাম সেই খরস্রোতা নদীতে। তারপর সে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম। একহাত এগোইতো দু'হাত পিছোই। স্রোতের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কে কোথায় হারিয়ে গেলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ঠিক নেই। দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত। সাঁতরাচ্ছি তো সাঁতরাচ্ছি। এক সময় কাহিল হয়ে পড়লাম। কোনোমতে নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছলাম অবশেষে। দেখলাম, সাথীরা সব হারিয়ে গেছে। তীরে উঠে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। সবাই এক জায়াগায় হতে বেশ সময় পেরিয়ে গেলো। কিন্তু ইলার দেখা নেই। গেলো কোথায় মেয়েটা? চিন্তায় পড়ে গেলাম। সাথীরা অনেকেই মন্তব্য করলেন, 'ইলার হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্যই এই অবস্থা! অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে তাঁর সাড়া মিললো। কাছে গিয়ে দেখলাম ইলা মিত্র এর মধ্যেই তীরে পৌঁছে গেছেন। কেবল পেটিকোট আর ব্লাউজ পরনে। শাড়িটা মেলে দিয়েছেন ঝোপের ওপর। সেই অবস্থায় আমরা এগিয়ে যেতেই আমাদের নাস্তানাবুদ অবস্থায় দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন তিনি। বললাম, "আপনার এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের জন্যই বিপ্লবের মুখ আর দেখতে পাবো না। তার আগেই মারা পড়তে হবে।" উত্তরে ইলা মিত্র শুধু হেসেই চললেন। সেদিন দেখেছিলাম সেই দুর্দান্ত মেয়েটির কী অপরিসীম প্রাণশক্তি। আর আজ জেলের অত্যাচার সইতে সইতে সেই দুর্দন্ত ইলা কৃশকায়, পাণ্ডুর হয়ে গেছেন। চোখের নিচে জমেছে কালি। তবুও সেই চোখে জ্বলছে ধিকিধিকি ক্রোধের আগুন।

রাজশাহী জেলে আমাদের তদারকির জন্য নিযুক্ত মেটকে দেখলাম ঘানিঘরের গফুরের মতো বদমাশ নয়। আচার-ব্যবহারে বেশ ভালো। আমাকে বললো, "আপনারা তো আবার কমিউনিস্ট। দেশের জন্য কাজ করছেন। আপনাকে তো আর শক্ত কাজ দেয়া যায় না।" বললাম, "সে খবর তুমি কী করে জানলে?" জবাবে বললো, "পাবনায় আপনি দু'দুটো ঘানি ভেঙেছেন, অনশন করেছেন, জানি, সব খবর জানি। খবর কি আর চাপা থাকে? এক কাজ করি, ডেপুটির বাসায় যে কয়েদিটা কাজ করতো, গতকাল সে খালাস হয়ে গেছে। যদি ঘরের কাজ করতে পারেন, তবে আপনাকে সেখানে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।" বললাম, "আমি রাজি আছি। ঘরের কাজ করতে আমার বাধবে না।"

অবশেষে সেই মেটের সুপারিশেই পরদিন আমার কাজ জুটলো ডেপুটি জেলারের বাসায়। সকালবেলা উঠেই মেট আমাকে নিয়ে গেলো ডেপুটি বাবুর ওখানে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ডেপুটি গিন্নি এসে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর বেশবাস দেখে আমার মন রিরি করে উঠলো। বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় শুধু পেটিকোট-ব্লাউজ পরে এসে দরজা খুলেই আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেনো মানুষ নয়, চিড়িয়াখানার আজ জীব দর্শন করছেন তিনি। মনে লজ্জা-সংকোচের বালাই নেই। কারণ জেলখানার কয়েদিরা তো চোর-ছ্যাঁচোড়। ওরা আবার মানুষ নাকি যে লজ্জা করতে হবে? কড়া সুরে মেটকে জিগ্যেস করলেন, " এ আবার কাকে নিয়ে এলে?" উত্তরে মিনমিনে গলায় মেট বললো, "মেম সাহেব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কয়েদি আজ থেকে আপনার বাসায় কাজ করবে। ও থালাবাসান মাজা, মশলা পেষা আর কাপড় ধোয়া সব কাজই জানে।"

ডেপুটি গিন্নি বললেন, "চোর-ছ্যাঁচোড় নয়তো? দেখো, কিছু চুরিটুরি করে আবার পালায় না যেনো।" মেট বললো, "খুব ভালো মানুষ মেম সাহেব, চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। অন্য কেসের আসামি।"

মেট চলে যেতেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেলো। প্রথমেই তাগাদা এলা মশলা পেষার। লেগে গেলাম মশলা পিষতে। কিন্তু এত কী সহজ মশলা পেষা! শিলের ডলা দিতেই পেঁয়াজ-রসুন ছিটকে বেরিয়ে যেতে লাগলো এদকি-সেদিক। আবার কুড়িয়ে এনে কোনো রকমে পেষার কাজটা সারা গেলো তো ফের তাগাদা এলো পুকুর ঘাট থেকে থালাবাসন মেজে আনার। একগাদা বাসনকোসন নিয়ে চললাম পুকুর ঘাটে। বাসার কাছেই জেলখানার পুকুর। বাসনকোসন মেজে-ঘষে বাসায় ফিরে এসে দেখি একটা গ্লাস নেই। মেম সাহেব তো রেগে অস্থির, "নির্ঘাৎ তুই চুরি করেছিস, শিগগিরই গেলাস বের কর, নাইলে ডাণ্ডা বেড়ি পরাবো সাহেবকে বলে।" বললাম, "বোধহয় পুকুরে গড়িয়ে পড়েছে। আমি খুঁজে দেখছি মেমসাব।"

সত্যিই ঘাটে গিয়ে খুঁজতেই পেয়ে গেলাম গ্লাসটা। তবু মেমসাহেবের বিশ্বাস হলো না। বললেন, "চুরির অভ্যেস যাবে কোথায়? গুঁতোর চোটে এখন বের করে নিয়ে এসেছে।" এইভাবে কাপড় ধোয়া আর গাই দোয়ানোর কাজ সারা হলে মেমসাহেব বললেন, "ওখানে ঐ বারান্দায় বসে থাক। দরকার হলে ডাকবো।"

আমি বারান্দার এককোণে চুপটি করে বসে রইলাম। ডেপুটির শালী অর্থাৎ বউ-এর বোন বারান্দায় বসে ইংরেজি পড়ছিলো তখন। আমি বসে বসে তাই শুনছি। ক্লাস ফাইভের ইংরেজি। একটা ভুল শব্দ বারবারই উচ্চারণ করে যাচ্ছে। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো শুদ্ধ উচ্চারণটা। আর যায় কোথা? ওমনি তেড়ে এলো ডেপুটির শ্যালিকা, 'বেয়াদব! এতবড় আস্পর্ধা, আমার পড়ার ভুল ধরা! চোর কোথাকার!"

গিন্নিও ছুটে এলেন সাথে সাথে। সব শুনেটুনে শুরু করলেন দুই বোনে মিলে যুগলবন্দি সুরে গালিগালাজ! এ থামে তো ও শুরু করে, ও থামো তো এ শুরু করে! বললাম, "চোর বলবেন না মেমসাহেব, আমি চুরি করে জেলে আসি নি।" ডেপুটি গিন্নি একেবারে চুপসে গেলেন। কারণ তখন কমিউনিস্টদের সৎ ও দেশপ্রেমিক বলে একটা খ্যাতি ছিলো। ডেপুটি গিন্নিরও সেটা অজানা ছিলো না। তাই তিনি বারবার মাফ চাইতে লাগলেন। এর মধ্যেই জেলখানার ঘন্টা বেজে উঠলো। সব কয়েদিকে এখন ফিরে যেতে হবে জেলখানায় আমার মেট এলো আমাকে নিয়ে যেতে। এরপর আর ডেপুটির বাসায় কাজে যাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেপুটির বাসায় কাজ করতে অস্বীকার করায় আমাকে 'গমে' অর্থাৎ যাঁতাঘরে গম পেষার কাজে দেয়া হলো। বললাম, 'ও কাজ করতে পারবো না। মেট জানালো, গম পেষার কাজ না করলে সে সুপারের কাছে নালিশ করতে বাধ্য হবে। বললাম, 'করোগে নালিশ, গম পেষা আমাকে দিয়ে হবে না।" যাঁতাঘরে গিয়ে ঠাঁই বসে রইলাম। উপায়ান্তর না দেখে যাঁতাঘরের মেট গিয়ে সোজা নালিশ করলো সুপার বিল সাহেবের কাছে। এই বদমায়েশ সুপারের কীর্তিকলাপের কথা এর মধ্যেই আমার জানা হয়ে গেছে। কয়েদি মেরে হাত কালো করেছেন এই গোরা। অথচ সুপারের চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরও এই ব্যাটা বহুদিন গোপালপুর চিনিকলের ম্যানেজার ছিলেন। তখনো কেউ খাপড়া ওয়ার্ডের রাজবন্দি হতাকাণ্ডে প্রতিশোধ নিলো না ভেবে আফসোস হয়।

পরদিন সকালেই আমাকে সুপারের অফিসে তলব করা হলো। তখন কয়েদিদের সুপারের সাথে দেখা করতে হলে একটু ফিটফাট হয়েই যেতে হতো। আমি আমার ডোরাকাটা কয়েদি টুপিটা পরে নিলাম মাথায়। গামচাটা কোমরে বেল্টের মতো করে পেঁচিয়ে মেটের সাথে গিয়ে হাজির হলাম তার অফিসে। অফিসের ভেতর আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার আড়াল থেকে স্যালুট দেয়ার জন্য ইশারা করতে লাগলো মেট। আমি ভ্রুক্ষেপও করলাম না। তখন আমার শরীরের মধ্যে আগুন ধরে গেছে এই খুনি ইংরেজ ব্যাটাকে দেখে। তুমি শালা গোরা আমার বন্ধু দেলওয়ারকে খুন করেছো। তোমাকে সালাম দেবো আমি! সুপার ব্যাটা বোধহয় আমার মনোভাব টের পেলেন। সোজা কাজের কথায় চলে এলেন। বললেন, 'গম পেষো নি কেনো?"

বললাম, 'পারবো না। গম পিষতে জেলে আসি নি। দরকার হলে কল বসাও সাহেব। আমি ও কাজ পারবো না।"

খাপড়া ওয়ার্ডের নৃশংসা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এর মধ্যে সারাদেশে বিক্ষোভের সূচনা করেছিলো। ঘৃণা আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো তাই নিয়ে সর্বত্র। তাই সাহেব বোধ হয় আমাকে বেশি চটাতে চাইলেন না। বললে, 'বটে! পিষবে না গম! আচ্ছা!" কথাটা শেষ করেই ডেপুটি ডেকে অর্ডার দিলেন, "সব পোষাক খুলে নাও। যতোদিন গম পিষতে অস্বীকার করবে, ততোদিন একে চটের পোশাক পরিয়ে রাখবে!" তারপর আমাকে হাত ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিলেন। চটের পোশাক ছিলো তখন শাস্তির প্রথম পর্যায়। আমাকে সেই চটের পোশাকই পরিয়ে দেয়া হলো। পরদিন থেকে চটের পোশাক পর যাঁতাঘরে বসে রইলাম। সময় হলেই সেলে ফিরে আসি। এভবেই এক সপ্তাহ কেটে গেলো। আবার ডাক পড়লো বিল সাহেবের ঘরে। আবারো সেই একই প্রশ্ন করলেন সাহেব, "গম পিষতে পারবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারও সেই একই উত্তর, "না, কক্ষনো না!"

এবার আমার নতুন শাস্তির ব্যবস্থা হলো। পনেরো সের পনেরো সের করে ত্রিশ সের ওজনের চেন লাগানো হলো দু'পায়ে। আমি সেই ভারি চেন পায়ে লাগিয়ে যাঁতাঘরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চেন থেকে শব্দ হতে লাগল ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। কয়েদিরা সচকিত হয়ে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো আমার দিকে।

তারপরের সপ্তাহে আবার ডাক পড়লো সুপারের অফিসে। সেই একই প্রশ্ন। আমারও সেই একই জবাব। বিল সাহেব এবার ভীষণ রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন, "ডাণ্ডা বেড়ি লাগাও।" জেলের কঠিনতম শাস্তি এই ডাণ্ডা বেড়ি। এই বেড়ি পরা থাকলে, হাঁটতে বা বসতে ভীষণ অসুবিধে হয়। তাই এবার আর আমি তেমন হাঁটাহাঁটি করতে পারলাম না। পা ফুলে যেতে লাগলো। দগদগে ঘা হয়ে গেলো দু'পায়ে। বেড়ির ঘষা লেগে লেগে দু'পায়ে সৃষ্টি হলো গভীর ক্ষত।

পরের সপ্তাহে সাহেব ভেবেছিলেন, এবারে বোধহয় আমি গম পিষতে রাজি হবো। কারণ আমার পায়ের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে রাজি না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু আমার ঐ একই উত্তর শুনে সাহেব হুকুম দিলেন ক্রসবার ফিটার লাগাতে। জেলখানায় ক্রসবার ফিটার সর্বাচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা। আমার এবার আরও চরম অবস্থা শুরু হলো। পায়ের ঘা বেড়ে গিয়ে তার থেকে কষ বের হতে লাগলো। সারাদিন ঝিম মেরে বসে থাকি যাঁতাঘরে। হাঁটতে চলতে কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ভালো লাগে না। যাঁতাঘর থেকে সেলে ফিরতে গেলে মনে হয় কতো দূরের পথ! অনেকেই আমার অবস্থা দেখে পরামর্শ দিলো সাহেবের কাছে নতি স্বীকার করতে। আমার এক কথা, জীবন গেলেও নত হবো না। পায়ের ব্যথায় রাতে জ্বর আসতে লাগলো। তবু আমি সেদিন ঐ খুনি বিলের কাছে নত হলাম না। আমার সেই জেল জীবনের ডাণ্ডা বেড়ির গভীর ক্ষতের দাগ এখনো আমার দু'পায়ে স্মৃতি হয়ে জ্বল জ্বল করছে। এরপর ডাক্তারের পরামর্শে কিংবা নিরুপায় হয়েই হয়তো সুপার বিল সাহেব আমার শাস্তি মওকুফ করেছিলেন। তবে যাঁতাঘরে আর আমাকে যেতে হয়নি কোনোদিনও।

মোটামুটি নির্বিঘ্নে এরপর আমার জেলজীবন কাটতে লাগলো। তবে কাজের কি আর মাফ আছে? সকালবেলা উঠেই বরাদ্দ দু'টুকরো রুটির সদ্ব্যবহার করা হলো কি আর রেহাই নেই, যার যার ওয়ার্ডের মেটরা এসে হাজির হবে। আমাদের এখনকার কাজ সবজি বাগানে। সে সময় জেলখানার সবজিতে বাজার ছেয়ে যেতো। আর তার পেছনে অমানুষিক শ্রম দিতে হতো জেল কয়েদিদের। ওয়ার্ডের সব কয়েদিকে লাইন করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হতো সবজি বাগানে। তারপর সারাদিন কঠোর পরিশ্রম। সন্ধ্যায় আবার বন্দি করা হতো সেলে। দুপুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটুক্ষণের জন্য খাওয়ার বিরতি। সে খাওয়াও যদি মুখে রুচতো! বৈচিত্র্যহীন জেলজীবন এভাবেই কাটছিলো আমার।

এর মধ্যে একদিন জেলের ভেতর সাড়া পড়ে গেলো। বাগান পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত কয়েদি ওয়ার্ডের সেলগুলো সাফসুতরো হতে লাগলো। দালানকোঠায় চুনকামের বহর দেখে আমাদের সন্দেহ হলো, ব্যাপার কি? হঠাৎ করে কর্তৃপক্ষ কয়েদিদের ওপর এতো সদয় হয়ে উঠলেন কেনো? শুধুই তাই নয়, আমাদের আবার একসেট করে নতুন পোশাক পর্যন্ত দেয়া হলো। এটা কিসের আলামত? ব্যাপার জানা গেলো পরে। গভর্নর নুরুল আমিন এবং হোম সেক্রেটারি আজিজ আহমদ খান আসছেন জেল পরিদর্শনে। তাই এত ঘটা। নির্দিষ্ট দিনে দুই রাজ অতিথি এসে পৌঁছুলেন। কয়েদিদের আগেই শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছিলো। তারা সেলের সামনের চত্তরে ফল-ইন-এর ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। কয়েদিদের সাথে দু'একটা কথাবার্তার পর অতিথিরা রাজবন্দিদের সাথে আলাপ করতে এলেন। রাজবন্দিরা দাবি তুললেন, তাদের যখন বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, তখন জেলের বাইরে তাঁদের ফ্যামিলির জন্য "ফ্যামিলি এলাউন্স'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। হোম সেক্রেটারি আজিজ আহমদ খান আমাদের কুশল জানতে চাইলে, আমি বললাম, "আপনারা আমাদের বিচারও করছেন না, আবার ছেড়েও দিচ্ছে না, এ কেমন কথা? মুসলিম লীগের মুসলমানদের দেশে এ কেমন বিচার? একজন রাজবন্দিকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হবে, অথচ জেলের বাইরে আমাদের পরিবার পরিজন না খেয়ে থাকবে, এটা কী করে হয়? তাদের কে খাওয়াবে? আর জেলে যদি আমাদের রাখতেই চান, তবে আমাদের পরিবারের জন্য 'ফ্যামিলি এলাউন্স'-এর ব্যবস্থা করুন।" আমার এই সৃষ্টি ছাড়া কাথাবার্তায় নুরুল আমিন সাহেব একটু বিরক্তই হলেন মনে হলো। তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। আজিজ আহমদ সাহেব কথা দিলেন, "আমরা ভেবে দেখবো এ ব্যাপারে।" যা হোক, এরপর সরকারের এক আদেশবলে অবশ্য আমাদের ফ্যামিলি প্রতি ১৫০ টাকা করে এলাউন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমার স্ত্রীর নামে মাসে মাসে পাঠানো হতো সে টাকা।

একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনাও আমার জেলজীবনের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। সেদিন সবজি বাগান থেকে কাজ সেরে জেল কর্মকর্তাদের বাসার সামনে দিয়ে সেলে ফিরছিলাম। পথে এক কুলঅলাকে দেখলাম। কুল ফেরি করছে বাসায় বাসায়। পাকা টসটসে কুল দেখে লোভ হলো খুব। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে দুটো কুল চেয়ে বসলাম কুলঅলার কাছে। লোকটা বোধ হয় মায়া হলো আমার ওপর। তাই হাতে তুলে দিলে বেশ ক'টি কুল। খেতে খেতে পথ চলছি। দেখি একটা বাংলোর সামনে একটি ফুটফুটে বাচ্চা খেলা করছে। দেখে কী যে ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলো! ঘরে আমারও তো ওমনি একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। কাছে গিয়ে দুটো কুল বাচ্চাটিকে দিতে গেলাম। সে কিছুতেই নিলো না। বরং ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। এমন সময় বাগানের ওপাশ থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। বাচ্চাটি দৌড়ে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে তার মাকে বললো, 'মা দেখো, চোর না কুল খাচ্ছে।" মহিলা হেসে ফেলে ছেলেটির হাত ধরে বাসার দিকে চলে গেলেন। বাচ্চা ছেলের মুখের ঐ ছোট্ট একটি কথা আমাকে খুবই বিচলিত করেছিলো সেদিন। হায়রে! যে দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে জেল খাটতে এলাম, সেই দেশেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের পরিচয় চোর হিসেবে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আসলে আমাদের সমাজে জেলের আসামি মানেই তো অপরাধী। সবার ধারণা জেলে গেছে যখন, তখন চোর-ছ্যাঁচোড় ছাড়া আর কি হবে? তখন জেলের ভেতরেও চোর-ডাকাত আর রাজবন্দিদের মধ্যে কোনো রকম ফারাক ছিলো না। জেল কর্তৃপক্ষই যখন এই পার্থক্য বুঝতো না, তখন অতোটুকুন বাচ্চা ছেলেই-বা কি বুঝবে?

মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মতো শাস্তি বোধহয় আর হয় না। বিশেষ করে সে মানুষটি যদি হয় সমাজ সচেতন। দীর্ঘদিন ধরে জেলে পচে মরছি। সময়তো আর কময় নয়। ঊনপঞ্চাশ থেকে এখন বায়ান্নোয়। গতানুগতিক জীবন। বাইরের জগতের সাথে নেই কোন সংস্রব। কতো লোক এলো-গেলো এই জেলে। বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন অপরাধের সব আসামি। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম সে সময়। রাজনৈতিক বন্দি ছাড়া বিভিন্ন অপরাধে শাস্তি পাওয়া আসামিরা জেলে এসে যেনো কেমন নিস্তেজ হয়ে যেতো। অধিকাংশের মনেই ধর্মভাব জেগে উঠতো। অনেককে দেখেছি বাড়ির কথা, বউ-ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়তে। মনে হতো বাইরে গিয়ে বোধ হয় তারা সমস্ত অপকর্ম ছেড়ে দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটতো না। অনেককেই দেখেছি খালাস পেয়ে একই অপরাধের কারণে আবার জেলে ফিরে আসতে। এমন চেনামুখ আমি কয়েকবার দেখেছি, যারা বাইরে বেরিয়ে তিন-চার মাসও থাকতে পারেনি। রাজশাহী জেলে একজন মেটকে জানতাম। বেচারা বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো। দেখে আসামি বলে মনেই হতো না। একদিন জিগ্যেস করেছিলাম "এই বয়সেও জেলে পড়ে আছেন কেনো? আপনার কি জেলের মেয়াদ ফুরোয়নি?" জবাবে সে বলেছিলো, খুনের অপরাধে একসময় যাবজ্জীবন হয়েছিলো। খালাস পাওয়ার পর বাইরে গিয়ে যখন দেখলো আত্মীয়-পরিজন যাদের বাইরে রেখে এসেছিলো, তারা কেউ আর বেঁচে নেই, বাড়িঘরও বেদখল হয়ে গেছে তখন আবার ফিরে এসেছিলো জেলেই। তবে নতুন কোনো অপরাধ করে নয়। কর্তৃপক্ষের হাতে-পায়ে ধরে জেলেই থেকে গিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলের নিভৃত কামরায় বসে বাইরের কোনো খবরই রাখতে পারি না। এখন যেমন জেলে জেলে রাজবন্দিদের দৈনিক খবরের কাগজ সরবরাহ করা হয়, তখন তেমন সুযোগ ছিলো না। এমন কি কেউ দেখা করতে এলে, তার কাছ থেকেও কিছু শোনার উপায় ছিলো না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো সি. আই. ডি'র লোক। যখনকার কথা বলছি সেই তখন চলছে ভাষা আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনকে ঘিরে দেশের মধ্যে কী হচ্ছিলো- না-হচ্ছিলো তার কিছুই আমরা জানতাম না। তবে ঢাকায় যেদিন গুলি হলো, ২১ ফেব্রুয়ারিতে, সে খবরটি কিন্তু রাজশাহী জেলের সবার মুখে মুখে ফিরেছিলো। কোথা থেকে কীভাবে জেলের ভেতর পৌঁছেছিলো সে খবর, কেউ তা বলতে পারে নি। তবে সবার মুখে এক কথা, ঢাকায় গুলি হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারিতে দেখলাম দলে দলে ছাত্রদের ধরে আনা হচ্ছে। কী ব্যাপার? ছাত্ররা নাকি মিছিল করেছে ঢাকায় একুশের ঘটনার প্রতিবাদে। অধিকাংশই কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। দেখলাম, কী তেজ ছেলেদের। এক নিমেষেই জেলের সব নিয়ম-কানুন তারা ভেঙে তছনছ করে দিলো। সেই সাথে হৈ-হুল্লোড় আর ভাঙচুর। চেঁচামেচি। এদের নিয়ে কর্তৃপক্ষ সত্যিই হিমশিম খেতে লাগলেন। আর জেলের দোর্দন্ড প্রতাপ মেটবাহিনী তারাও যেনো রাতারাতি কেন্নো আর কেঁচো হয়ে গেলো। রাতে আমরা রাজবন্দিরা মিলিত হলাম ছাত্রদের সাথে। কর্তৃপক্ষ কোনো বাধা দিলেন না। আর বাধা দিলেও শুনছে কে? খোঁজখবর নিলাম ছাত্রদের কাছে বাইরের হালচাল সম্পর্কে। ওদের কাছ থেকেই প্রথম বাইরে জগতের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে হদিস পেলাম।

আমাদের সিংহপুরুষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিল সাহেব, রাতে ছাত্রদেরকে অন্য সেলে ঢোকানোর অর্ডার দিলে ছেলেরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বসলো। কেউ সেলে যেতে চায় না। সবাই রাজবন্দিদের কাছে থাকবে। ছেলেদের চেঁচামেচিতে বাধ্য হয়ে বিল সাহেব শেষ পর্যন্ত তার অর্ডার স্থগিত রাখলেন। ছেলেরা আমাদের কাছেই রইলো। কতো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গল্প শুনলাম তাদের কাছ থেকে। কেমন করে তারা মিছিল করলো, পুলিশ কীভাবে লাঠিচার্জ, ধরপাকড় করলো কিছুই বাদ রাখলো না তারা। এসব শুনেটুনে আমার মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো, না, তাহলে বাইরে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে। সবকিছু থেমে যায়নি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মনে পাকিস্তানঅলারা মোহ সৃস্টি করতে পারে নি। সেবার ছাত্ররা প্রায় সপ্তাহ খানেক রইলো জেলে। সময়টা তখন আমাদের খুব ভালো কেটেছিলো।

চুয়ান্নতে এসে জেলে বসে বসেই খবর পেতাম, রাজবন্দিদের মুক্তি আর নির্বাচনের দাবিতে বাংলার মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। এরপর তো গণআন্দোলনই শুরু হয়ে গেলো। আমাদের জেলে দলে দলে রাজবন্দি আসতে লাগলো। অবশেষে আন্দোলনের তোড়ে লীগঅলারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হলেন। রাজবন্দিদের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর পেতাম, এবারের নির্বাচনে মুসিলম লীগকে ভরাডুবি করাতেই হবে। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এরা এক প্লাটফরমে এসে যাচ্ছেন। ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার চেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট নৌকো প্রতীক নিয়ে নামলো নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পূর্ববাংলার মানুষ যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিলেন নৌকো প্রতীকে। বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো যুক্তফ্রন্ট। এর কিছুদিন পরই আমি জেল থেকে মুক্তি পেলাম।

এভাবেই '৪৯-এর খুদের বিরোধী আন্দোলন আমার জীবন থেকে কেড়ে নিলো পাঁচ পাঁচটি বছর। সে সময় রেলের রেশনের খুদ দেয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলো সারা পূর্ব পাকিস্তানের রেল শ্রমিকরা। এমন কি সে সময় বিহারি শ্রমিকরা পর্যন্ত এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, পাহাড়তলি, লালমনিরহাট, আর চট্টগ্রাম-সব জায়গার শ্রমিকরাই অংশ নিয়েছিলো এ আন্দোলনে। সে সময় সৈয়দপুর রেল স্টেশনে সংগঠিত হয়েছিলো একটি ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন। বোধ করি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে প্রথম 'ঘেরাও' আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো সৈয়দপুর রেল স্টেশনেই।

আগেই বলেছি আমার পোস্টিং ছিলো ঈশ্বরদীতে। ট্রেন নিয়ে ঈশ্বরদী থেকে আমনুরা, খুলনা আর পার্বতীপুর লাইনে প্রায়ই আমাকে যেতে হতো সে সময়। একদিন ঈশ্বরদী থেকে পার্বতীপুর গেছি ট্রেন নিয়ে। সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেন নিয়ে সোজা হলদিবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছি। ফিরতি পথে সৈয়দপুর যখন পৌঁছুলাম, তখন দেখি প্লাটফরম লোকে লোকারণ্য। লোকজনের অধিকাংশই সৈয়দপুর ওয়ার্কসপের রেলের শ্রমিক। কী ব্যাপার? শুনলাম যোগাযোগমন্ত্রী নিস্তার সাহেব এসেছেন ওয়ার্কসপ পরিদর্শনে। এক্ষুনি ফিরে যাবেন। আর আমাদের লোকাল ট্রেনের সাথেই নাকি জুড়ে দেয়া হবে তার সেলুন। মুসলিম লীগের মন্ত্রী আবদুর রব নিস্তার সেলুন থেকে নামলেন প্লাটফর্মে। মাথায় বিরাট পাগড়ি বাঁধা। দশাসই একজোড় গোঁফ ঝুলছে নাকের দু'পাশ থেকে। শেরওয়ানি-পাজামা পরনে। একেবারে খান্দানি চেহারা। উপস্থিত শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি। সৈয়দপুর তখন বিহারিতে ঠাসাঠাসি। তাই আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, 'বিহার শরিফ'। ওয়ার্কসপের অধিকাংশ শ্রমিকই বিহারি। অবিভক্ত ভারতের লিলুয়া আর খড়গপুর ওয়ার্সশপে একসময় কাজ করতো এরা। দেশ-বিভাগের সময় অপশন নিয়ে চলে এসেছে সৈয়দপুরে। আমাদের লাল ঝাণ্ডা করতো গোলাপ। বলিষ্ঠ কর্মী ছিলো একসময়। তাকেও দেখলাম শ্রমিকদের সামনের কাতারে। আর একজন নামকরা মিস্ত্রি-'রহমান মিস্ত্রি' নামেই তার পরিচিত ছিলো বেশি, দেখলাম সেও এসেছে। ভিড়ের কাছে পৌঁছুতেই শুনলোম, রেশনে খুদের বদলে চাল দেবার দাবি জানাতেই তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে সমবেত হয়েছে। রহমান মিস্ত্রি হাতে করে নিয়ে এসেছে রেল ইঞ্জিনের একটি মডেল। সে নিজেই বানিয়েছে সেটা। মন্ত্রীর ভাষণ শেষ হলে শ্রমিকরা ঘিরে ধরলো তাঁকে। পেছন থেকে স্লোগান উঠলো, "রেশন মে চাওয়াল দেনে হোগা।" শ্রমিকরাও একযোগে মন্ত্রীর কাছে দাবি জানালো, রেশনে খুদের বদলে চাল দিতে হবে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে সেই রহমান মিস্ত্রি এগিয়ে এলো। হাতের ইঞ্জিনটি দেখিয়ে বললো, 'হুজুর আপ হামলোগকো বয়লার মে পেটা কয়লা দেনেছে, হামলোগ ভি আপকো বয়লার চালু রাখেঙ্গে। শ্রমিকরাও সেই সাথে আওয়াজ তুললো 'রেশন মে চাওয়াল দেনে হোগা, নেহিতো চাক্কা বান্দ। এবার দেখলাম মন্ত্রী সাহেব কিছু বিরক্ত হলেন। রেলের পাঞ্জাবি আমলারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়ার জন্য। শ্রমিকরাও অনড়। দাবি না মানা পর্যন্ত কিছুতেই মন্ত্রীকে যেতে দেবে না। এতোক্ষণ ইঞ্জিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম এইসব কাণ্ডকারখানা। এবার ইঞ্জিন থেকে নেমে এসে সোজা গিয়ে হাজির হলাম গোলাপের কাছে বললাম, "ওভাবে হবে না গোলাপ। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে।" গোলাপ আমাকে পেয়ে যেনো হাতে চাঁদ পেলো। উৎসাহিত হয়ে বললো, 'কিয়া কারণে হোগা জসীম ভাইয়া, মতলব বাতা দো।"

আমি বললাম, "মন্ত্রী সাহেব দাবি না মানলে তোমরা কিছুতেই লোকাল ট্রেনের সাথে সেলুন লাগাতে দেবে না।" আর জোর কোরে সেলুন লাগালেও সান্টারদের বলে রাখবে যেনো কাপলিং না লাগায়। তা হলেই আমরা ট্রেন ছেড়ে দিলে সেলুন স্টেশনেই পড়ে থাকবে। তখন তোমরা ইচ্ছেমত ঘেরাও করে দাবি আদায় করে নেবে।"

গোলাপ আমার কথামতো সান্টারদের সাথে আলাপ করে এলো। এ দিকে মন্ত্রী সাহেব শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা করে সেলুনে গিয়ে উঠলেন। আমার ড্রাইভার বাহাদুর খান ইঞ্জিন কেটে নিয়ে সান্টিং করে সেলুন লাগালেন ট্রেনের সাথে। কিন্তু সান্টাররা সেলুনের সাথে কাপলিং না লাগিয়ে গোপনে খুলে রাখলো সেটা। সময় হলে হুইসেল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলাম আমরা। প্লাটফর্মে শয়ে শয়ে শ্রমিক স্লোগান দিতে লাগলো। ট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে এলো; কিন্তু সেলুন যেখানকার সেখানেই পড়ে রইলো। এবার মন্ত্রী সাহেব তো রেগে আগুন! অফিসাররা শ্রমিকদের কারসাজি বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি সিগনাল তুলে দিয়ে ট্রেন থামালেন। আমাদের ট্রেন তখন সৈয়দপুর স্টেশনের রেলগেটের কাছে চলে এসেছে। দেখি, আমাদের পাঞ্জাবি ডি. এম. ই. ছুটতে ছুটতে আসছেন। এসেই তো মুখে যা আসে তাই বলে গাল দিতে লাগলেন। বললেন, "কাপলিং কিউ নাহি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগায়া?" আমাদের বিহারি ড্রাইভার বাহাদুর খান জবাব দিলেন, "হামলোগ কিয়া জানতা, সান্টার কো পাস পুছিয়ে।"

ব্যাটা পাঞ্জাবি ডি. এম.ই. এ-ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করেছিলেন। বললেন, 'তুমহারা ফায়ারম্যান জসীম ইয়ে কাম কিয়া হায়।" আমার ড্রাইভার ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ, তিনি আমার পক্ষে সাফাই গাইতে লাগলেন।

যা হোক এতোক্ষণে পাঞ্জাবি মন্ত্রী নিস্তার সাহেব বুঝে ফেলেছেন, দাবি না মানলে তাঁর আর নিস্তার নেই। তিনি শ্রমিকদের ডেকে আশ্বাস দিলেন, "ঠিক হায়, তুমলোগ কো চাওয়ার দেনে কসুর কিয়া যায়ে গা।" এবার কিন্তু কাপলিং ঠিকই লাগলো। এভাবেই দাবি মেনে নিয়ে মুসলিম লীগের জাঁদরেল মন্ত্রী আবদুর রব নিস্তার সেদিন নিস্তার পেয়েছিলেন সৈয়দপুর ওয়ার্কসপের শ্রমিকদের কাছ থেকে।

পাকিস্তান আমলে এসে দেখলাম রেলের অধিকাংশ পাঞ্জাবি অফিসার খচ্চরের একশেষ। শ্রমিকদের তাঁরা মানুষ বলেই মনে করতে চান না। অথচ বৃটিশ আমলে অনেক সাহেব-অফিসার দেখেছি তারা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেই আমলের কয়েকটা ঘটনার কথা বলি।

কাঠিহার লোকোসেডে কাজ করছি তখন আমি। সেই আমলে ড্রাইভার-ফায়ারম্যানদের ডায়াগ্রাম দেয়া থাকতো সপ্তাহের পাঁচদিন তাদের ইঞ্জিনে থাকতে হবে। অর্থাৎ ট্রেন নিয়ে বাইরে যেতে হবে। অবস্থাটা সাংঘাতিক অমানবিক। সপ্তাহের পাঁচদিনই ড্রাইভার-ফায়ারম্যানরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারেন না। থাকে মাত্র দুটো দিন, সেই দুটো দিনের মধ্যে একদিন আবার সেডে গিয়ে হাজিরা দিতে হতো। আগামী সপ্তাহের ডায়াগ্রাম জেনে নেবার জন্য। একদিন শুধু পাওয়া যেতো রেস্ট। সে দিনটি সংসারের কাজকর্ম সারতে সারতেই ফুরিয়ে যেতো। এর ফলে কোনো ড্রাইভার-ফায়ারম্যানের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। অনেকে তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলতো, এভাবে কাটালে কারুরই সন্তানের মুখ চোখে দেখতে হবে না।

একদিন খবর পেলাম, আমাদের রেলের ম্যানেজার বেস্থল সাহেব কাঠিহার ইয়ার্ড পরিদর্শনে আসবেন। আমরা শ'খানেক ড্রাইভার-ফায়ারম্যান মিলে যুক্তি করলাম, যেভাবেই হোক সাহেবের সাথে দেখা করে আমাদের সাপ্তাহিক ডিউটির দিন কমিয়ে নিতে হবে সেই তখন একটা ব্যাপার দেখা যেতো, যেকোনো সমস্যার কথা সাহেবদের কাছে না বলে মেমসাহেবদের কাছে যদি কোনোক্রমে তুলে ধরা যেতো, তবে জাদুর মত কাজ হতো। আমরা ঠিক করলাম সাহেবের সেলুন যখন কাঠিহার প্লাটফরমে রাখা হবে, মেমসাহেবও থাকবে সেলুনে, সে সময়ই মওকা বুজে আমাদের দেখা করতে হবে। তখন তো সাহেব সুবোর সাথে দেখা করাই বড় কঠিন ব্যাপার ছিলো। তা'ছাড়া আমরা যারা শ্রমিক আন্দোলন করতাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের তো ভয়ানকভাবে সন্দেহ করা হতো। আমাদের শলাপমার্শ দেখেই লোকোসেডের বড়বাবু বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, "কি ব্যাপার, তোমরা আবার কিসের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছো?" বললাম, "কই না তো? ষড়যন্ত্র পাকাতে যাবো কেনো?"

নির্দিষ্ট দিনে সাহেব তো এলেন লোকোসেড পরিদর্শনে। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ডিভিশনাল অফিসারের দঙ্গল। তাঁরাই অধিকাংশ সময় বেস্থল সাহেবকে ঘিরে রাখলেন। আমরাও মওকা খুঁজতে লাগলাম কখন সাহেবকে বাগে পাওয়া যায়। সুযোগ একটা এসে গেলো দুপুরের খাবার পর। সাহেব তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা সবাই সুযোগ বুকে হাতে দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে সাহেবের সেলুনের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু কাছে কি আর ভেড়া যায়? লাল পাগড়ি পাহারাদার আর অন্যান্য অফিসার এসে আমাদের নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন, কি সমাচার? কেনো দেখা করবে? গণ্ডগোল পাকাবে না তো? আমরা বললাম, "কোনো কিছুই করবো না। শুধু সাহেবের সাথে একটু দেখা করতে চাই।"

আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনে সাহেব শেষ পর্যন্ত সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বৃটিশ সাহেব, কি জানি তাঁর বিশ্রামের কোনো ব্যাঘাত ঘটল কি না! মোসাহেব ধরনের অফিসাররা তো সাংঘাতিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাহেব তাঁদের ডেকে বললেন, 'ওরা কি চায়?" একজন অফিসার ছুটে গিয়ে সাহেবকে বললেন, "ওরা এই সেডের লেবার, আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে।" সাহেব বললেন, "ডাক ওদের।" এবার অর্ডার পেয়ে আমরা একে একে সেলুনের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। হাতের ফুলের একটা তোড়া সাহেবের হাতে তুলে দিতেই সাহেব সন্তুষ্টচিত্তে হাসলেন একটুখানি। তারপর বললেন, "তোমরা কি চাও?" আমরা বললাম, "আমাদের ড্রাইভার-ফায়ারম্যানদের সপ্তাহে পাঁচদিনই ইঞ্জিনে কাটাতে হয়। বাকি দু'দিন সংসারে নানান ঝামেলায় কেটে যায়। তাই আমরা বউদের কাছে থাকবার সুযোগ পাচ্ছি না। ফলে আমাদের বাচ্চাও হচ্ছে না। হুজুর, দয়া করে আমাদের ইঞ্জিনে ডিউটির দিন কমিয়ে দিতে হবে।" শুনে সবাই তো হো হো করে হেসে উঠলেন। বুঝলাম, সন্তান না হওয়ার কথা তো খোলাখুলিভাবে বলায় সাহেব মজা পেয়েছেন। হাসির শব্দ শুনে মেমসাহেবও বেরিয়ে এলেন। সাহেবের কাছে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। সাহেব ব্যাপারটা মেমসাহেবকে বুঝিয়ে বলতেই মেমসাহেবও হেসে ফেললেন। আমাদের ডেকে রসিকতা কলে বললেন, "ক'দিন ছুটি পেলে তোমরা তোমাদের "ওয়াইফদের" সঙ্গে "লাভ" করতে পারো?" আমরা বললাম, "মেম সাহেব তিনদিনই হলেই চলবে।" এবার মেমসাহেব হেসে বললেন, "তাই হবে, এখন যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খুশি মনে মেমসাহেবকে বাকি ফুলের তোড়াটা উপহার দিয়ে "থ্যাঙ্ক ইউ" থ্যাঙ্ক ইউ" বলতে বলতে ফিরে এলাম। বলাবাহুল্য, তারপর থেকে আমাদের সপ্তাহে চারদিন ইঞ্জিনে ডিউটি করতে হতো। বৃটিশ সাহেবরা যে এত রাগী আর গম্ভীর ছিলো, তবু তাঁদের মধ্যে হাস্যরসের ব্যাপারটা কিন্তু সব সময়ই উপস্থিত থাকতো। সুযোগ বুঝে আমরাও তাঁদের সাথে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে ছাড়তাম না। একবার এক সাহেব এসেছেন বাজারে, আমাদের রেলেরই সাহেব। নতুন এসেছেন বোধহয়। বাজারের ফলমূল তেমন চেনেন না। রেলের লোক দেখে আমাদের দু'একজনকে সাথে নিলেন বাজার করার সময়। আমরা এটা-ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি সাহেবকে। সাহেবও আমাদের কথামতো কিনে নিচ্ছেন সেসব। তরকারি বাজারে এসে দেখলাম, লাউ বিক্রি হচ্ছে। টাটকা জালি লাউ। দেখতে খুব সুন্দর। সাহেবেরও পছন্দ হলো বুঝি। একটা লাউ তুলে নিয়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন, "হোয়াট ইজ দিস?" উত্তরে আমি কাজ চালানো ইংরেজিতে বললাম, "ফ্রুট, ভেরি সফট, ভেরি সুইট?"

"সুইট?" জিগ্যেস করলেন সাহেব। বললাম, "ইয়েস।" তখন তো লাউয়ের দাম মাত্র এক পয়াসা। সাহেবের কাছ থেকে একটাকা নিয়ে কিনে দিলাম লাউটি। কিন্তু গোল বাধলো অন্য জায়গায়।

বাসায় নিয়ে গিয়ে সাহেব লাউ কেটে খাবার চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু কই, মিষ্টি তো লাগছে না। রেগেমেগে সাহেবকে একেবারে অস্থির আমার ওপরে। পরদিনই অফিসে ফেটে পড়লেন আমার ওপর। বললাম, কি হলো সাহেব, রেগে যাচ্ছো কেনো? সাহেব বললেন, "কি ফ্রুট কিনে দিয়েছো? মোটেই মিষ্টি নেই।" আমি বুঝিয়ে বললাম, "সাহেব ফ্রুটটি কাচা তো, তাই মিষ্টি হয়নি। পাকলে ঠিকই মিষ্টি হতো।"

সে সময় সাহেবদের মধ্যে অনেক বামপন্থী মনোভাবের লোকজনেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদের কথাবার্তা থেকেই প্রায়ই ধরা পড়তো সেটা। বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার সাথে ইঞ্জিনে ডিউটি পড়েছিলো সামরিক বাহিনীর একজন ড্রাইভারের। তিনি প্রায়ই আমার সাথে রাশিয়ার বিপ্লব ও কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন।

একবারের একটি ঘটনার কথা বলি। ট্রেন নিয়ে যাচ্ছি কোলকাতা থেকে রানাঘাটে। পথিমধ্যে পেটে ব্যথা অনুভব করলাম। তার মানে তখন তখুনি আমাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিলে আর চলছে না। আমার গোরা ড্রাইভারকে সে কথা জানাতেই তিনি বললেন, নেক্সট স্টেশনে গাড়ি থামলে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে কর্মটি সেরে এসো। তাই করলাম। পরের স্টেশন এলেই আমি ফার্স্ট ক্লাসের বগিতে উঠতে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধাক্কাধাক্কি করতেই এক ইংরেজ সাহেব এসে আমার কালিঝুলি মাখা চেহারা দেখেই বলে উঠলেন, "এটা ফার্স্ট ক্লাস। এখানে ওঠা যাবে না।" এদিকে তখন আমার পেটের চাপ দ্বিগুণ বেড়েছে। আবারও ট্রেনে ছেড়ে দিয়েছে। অন্য বগিতে যাবো, সে উপায়ও নেই। সাহেব কিছুতেই দরজা খুলবেন না। শেষে আরও ক'জন সাহেব উঠে এলেন। আমার অসহায় অবস্থা দেখে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, "কি চাও?" বললাম, "আমি এই ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান। একটু ল্যাটিনে যাবো। তাই এসেছি।" বলেই ল্যাটিনে ঢুকে পড়লাম। ওখানে বসে বসেই শুনি সাহেবদের মধ্যে ভীষণ তর্ক বেধে গেছে। আমাকে যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তিনি আমার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখছেন। বলছেন, "ওরা গাড়ি চালাবে, অথচ ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকতে পারবে না, এ কেমন কথা? তাহলে তো ওদের জন্য ইঞ্জিনে ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। ট্রেন থামিয়ে তো আর ল্যাট্রিনের কাজ সারতে পারে না?" সে সময় সাহেবদের মধ্যেও উদারনৈতিক মনোভাবের লোক অনেকেই ছিলেন। যাঁরা প্রকৃতই এদেশের মানুষকে ভালোবাসতেন।

পাকিস্তান হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন আমাদের লাল ঝাণ্ডা সংগঠনের বিভক্তি ঘটেনি। তখনো জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ী, কমনীয় দাশগুপ্ত এরা লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থা রইলো না। পাকিস্তানের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কারণে আমাদের সংগঠনের হিন্দু কমরেডরা পদে পদে নিগৃহীত হতে লাগলেন। এছাড়া বিহার থেকে অপশন নিয়ে আসা বিহারি শ্রমিকরা হিন্দুদের দু'চোখে দেখতে পারতো না। মুসলিম লীগের পাণ্ডারা তখন সুযোগ বুঝে তাদের মধ্যে প্রবল হিন্দু-বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলো। অন্যদিকে পাকিস্তান হওয়ার পরই জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় নেমেই ফতোয়া দিলেন, "হিয়া কৈ ইজম-উজুম নেহি চালেগা। আগার কোই বোলে তো শির কুচাল দেঙ্গা।"

কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ ঘোষণা করা হলো। আমাদের সংগঠনের অধিকাংশ হিন্দু নেতাই ভারতে চলে গেলেন। যাঁরা আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়ে গেলেন, তারাও যে খুব একটা নিরাপদ রইলেন, তা নয়।

সে সময়ের একটা মিটিং-এর কথা মনে আছে। সৈয়দপুরে আজাদি মাঠে (জিন্নাহ মাঠ) রেল রোড ওয়ার্কাস ইউনিয়নের মিটিং। বক্তা হিসেবে এসেছেন লাল ঝাণ্ডার কমনীয় দাশগুপ্ত, ইসমাইল, সোমানাথ লাহিড়ী আর ধীরেন দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতা। "পাকিস্তানে এসেও শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না, পাক সরকার কোনো দিনই শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেবে না যতোক্ষণ না শ্রমিকরা আন্দোলনের পথে এগোবে-" এই ছিলো নেতাদের বক্তব্য। হঠাৎ দেখি শ্রমিকদের মাঝখান থেকে বিহারি শ্রমিকরা সোরগোল শুরু করেছে, "হিয়া কোই ঝাণ্ডা উণ্ডা নাহি চলে গা। হামলোগ মিট্টি খাকে রাহেগা। তোড় দো মিটিং উটিং-এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে বলতে লাঠিসোটা নিয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে আসতে লাগলো বিহারিরা। আমাদের লাল ঝাণ্ডা যে সব কর্মী ছিলো তারাও দেখলাম কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কোনোরকমে সেদিন নেতারা উদ্ধার পেলেন বিহারি শ্রমিকদের রোষানল থেকে। তবে লাল ঝাণ্ডার বিহারি শ্রমিকরা সেদিন আমাদের বিরোধিতা করে নি। সৈয়দপুর থেকে রেললাইন ধরে হেটে আমাদের নেতবৃন্দ গভীর রাতে পার্বতীপুর পৌঁছেছিলো সেদিন।

পরে যখন এই সব বিহারি শ্রমিক দেখলো পাকিস্তানে এসেও তাদের অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয়নি, তখন কিন্তু তাদের এই উগ্র পাকিস্তান-প্রীতি আর রইলো না। আর মাটি খেয়ে থাকার কথাও তারা কোনোদিন বলতো না। আমরা তখন ঠাট্টা করে বলতাম, "শিয়াল যেমন উলুর ফুল দেখে দই মনে করে আকাশ থেকে মাটিতে নেমেছিলো, তোমরাও পাকিস্তানে এসেছিলে নরম নরম রাসালো ফল খাবে বলে। তো এখন ফলের বদলে ঘোড়ার আণ্ডা খেয়ে থাকো, আর কি করবে?"

'৫৪-র এপ্রিলের দিকে বোধ করি, ফজলুল হক সাহেব যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। বাঙালিরা এই বিজয়কে রাজনৈতক বিজয় মনে করে আনন্দে গদগদ হলো। কিন্তু পাঞ্জাবি চক্র আর মুসলিম লীগওলারা সহজভাবে মেনে নিতে পারলো না বাঙালির এই বিজয়কে। ফলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হলো দেশ জুড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি আনলেন দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। এছাড়া উস্কে দেওয়া হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। পূর্ববাংলায় দমননীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে সরকার গঠনের মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিন পর যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে ৯২ক. ধারায় গভর্নরের শাসন জারি করা হলো। ইস্কান্দার মির্জা হলেন পূর্ব বাংলার গভর্নর। আর সেই সাথে রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর নেমে এলো আরেক দফা দমননীতির খড়গ। শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে পোরা হলো জেলে। আমিও রেহাই পেলাম না তার আওতা থেকে।

এ সময় রাজশাহী জেলে কিছুদিন থাকার পর আমার বিশৃঙ্খল আচরণের (এ-অভ্যেসটি ছিলো সব সময়ই) জন্য আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হলো। ঢাকা জেলে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু কর্মী-নেতা বন্দি জীবন যাপন করছেন। দেখা হলো এককালের নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কমরেড নগেন সরকারের সাথে। নগেন সরকার ছিলেন সদাহাস্য, সদালাপী মানুষ। চিরকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন তিনি। মাথায় গান্ধী টুপি পরতেন আর একের পর এক সিগারেট খেতেন। সাধারণত দামি সিগারেট পছন্দ করতেন তিনি।

তখন ঢাকা জেলের রেওয়াজ ছিলো, তিন মাস অন্তর অন্তর রাজবন্দিদের 'রিভিউ বোর্ড'-এর সামনে হাজির করা। রিভিউ বোর্ড-এ জাস্টিস সাহেব আমাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন, আমাদের বোধোদয় হয়েছে কি না, রাজনীতির প্রতি আমাদের আর কোনো মোহ এখনো আছে কি না, ইত্যাদি। নিদিষ্ট দিনে আমাদের প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হতো ঢাকা জজ কোর্টে। জজ কোর্টের বারান্দায় সার সার চেয়ার দিয়ে বসিয়ে রাখা হতো আমাদের। আশপাশ পুলিশ ও ডি, আই, বি রা কর্ডন করে রাখতো। আমাদের যেদিন রিভিউ বোর্ড- এর তারিখ পড়তো, খবর পেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শত শত ছাত্র আসতো। আসতো রাজনৈতিক কর্মীরা, সাধারণ মানুষেরা। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা আমাদের পত্র-পত্রিকা আর সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে যেতো। ছাত্ররা আমাদের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো, যদিও সেটা ছিলো আইন-বিরোধী ব্যাপার। তবুও বাঙালি পুলিশ ডি, আই, বি রা এসব দেখেও না দেখার ভান করতো। অবশ্য বিহারি পুলিশরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করতো। তবু ছাত্ররা ছাড়তো না। আমাদের বেশ আনন্দই লাগতো বাইরের লোকের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায়। তাছাড়া অনেকদিন পর জেলের বাইরের পরিবেশে এসে নিজেকে কেমন স্বাধীন-স্বাধীন মনে হতো। সবচাইতে বেশি খুশি হতেন নগেনদা। বিশেষ করে দামি সিগারেট পাওয়ার কারণে। কোর্টের বারান্দায় বসে তিনি একের পর এক সিগারেট টানতেন আর ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়তেন। ভাব দেখে মনে হতো নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আয়েশ করে যেনো সিগারেট টানছেন। নগেনদা বলতেন, "কি বলেন জসীমদা, এই রিভিউ বোর্ড ব্যবস্থাটা মন্দ নয়! এই অছিলায় বাইরের আলো-বাতাস গায়ে লাগলো। এভাবে চললে বছর পাঁচেক নির্বিঘ্নে জেলে কাটিয়ে দেয়া যাবে।"

একদিন ঘটনা। আমরা বসে আছি কোর্টের বারান্দায়। একে একে ডাক পড়ছে রাজবন্দিদের জাস্টিস সাহেবের চেয়ারে। প্রথমে নগেনদা। নগেদনদা তো আয়েশ করে ধুমপান করতে করতেই ঢুকলেন চেম্বারে। আমরা কৌতূহলবশত চেম্বারের জানালায় উকি দিলাম। জাস্টিস সাহেব নগেনদাকে কি প্রশ্ন করেন তা শোনার জন্য। নগেনদা তো গজেন্দ্রগমনে গিয়ে বসলেন জাস্টিস সাহেবের বিরাট টেবিলের সামনেকার চেয়ারে। সাহেব প্রথমেই প্রশ্ন রাখলেন, "আচ্ছা নগেন বাবু, এই যে জেলের ভেতর এতো কষ্টের মধ্যে আছেন, এতে করে আপনার খারাপ লাগে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগেনদা বললেন, "খারাপ লাগবে কোন দুঃখে? বেশ তো আছি। আপনারা দানাপানি দিচ্ছেন, খাচ্ছিদাচ্ছি, আর বসে বসে ঝিমুচ্ছি!" তারপর হাতের দামি সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, "তাছাড়া আপনাদের রিভিউ বোর্ড-এর কুদরতে দামি সিগারেট পাচ্ছি, বাইরের খোলা হাওয়া গায়ে লাগাচ্ছি। অসুবিধে কি?"

জাস্টিস সাহেবের প্রশ্ন, "আপনার ছেলেমেয়ে কিংবা স্ত্রীর জন্য মন খারাপ করে না? রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বেশতো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করতে পারেন।" নগেনদা বললেন, "বিয়েই করি নি তার আবার সংসার!" বিয়ে করেননি কেনো?" নগেনদার উত্তর, "কেনো, এ প্রশ্ন করছেন কেনো? আপনি কি কন্যাদায়গ্রস্ত? কয়টি সোমত্ত কন্যা আছে আপনার ঘরে?"

জাস্টিস সাহেবতো এবার মহাবিব্রত। তাড়াতাড়ি করে বললেন, "ঠিক আছে যান, আপনাকে আর প্রশ্ন করার নেই।" নগেনদা একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে।

এবার আমার পালা। জাস্টিস সাহেব প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা এই যে দীর্ঘদিন জিলে আছেন, আপনার খারাপ লাগে না?"

আমার উত্তর, "খারাপ লাগবে কেনো?"

"মনে হয় না, রাজনীতি করে কি পেলেন?"

আমি বললাম, "কিছুই মনে হয় না, আমরা কমিউনিস্টরা আশাবাদী। জানি আমরা একদিন সফল হবোই। তাছাড়া আমরা রাজনীতিতে ব্যক্তি স্বার্থ খুঁজতে যাই না।" জাস্টিস সাহেব বললেন, "দেশের বাড়িতে আপনার স্ত্রী-পুত্রদের ফেলে এসেছেন, তারা কি হালে আছে, তা ভেবে দুঃখ লাগে না?"

"দুঃখ লাগে, সেই সাথে ক্ষোভও হয়। আর সেটা স্ত্রী-পুত্রদের দুঃখ-কষ্টের জন্য যে আপনারাই দায়ী, একথা ভেবে। এই যে আপনারা আমাদের বছরের পর বছর ধরে বিনা বিচারে আটক রেখেছেন, একবারও কি ভাবেন, আমরা এভাবে জেলে পচলে আমাদের পরিবার-পরিজন কি খেয়ে বাঁচবে? যে ফ্যামিলি এলাউন্সের ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, তাও সামান্য। ওতে কি আর একটি পরিবার চলে?"

জাস্টিস সাহেব বললেন, "কি পরিমাণ এলাউন্স হলে চলে?"

বললাম, "কম করেও তো তিনশো টাকা লাগে, সেখানে আপনারা দিচ্ছেন মাত্র দেড়শো টাকা।"

জাস্টিস সাহেব বললেন, "আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন।" আমি বেরিয়ে এলাম চেম্বার থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্ড অব রিভিউ-এর কয়েকদিন পর আমার কাছে একটা চিঠি এলো। তাতে বলা হলো, কতো টাকা এলাউন্স বাড়ালে আমার চলে, তা জানিয়ে গভর্ণরের বরাবর একটি দরখাস্ত করতে হবে। আমি আমার ফ্যামিলি এলাউন্স দেড়শো টাকা থেকে বাড়িয়ে তিনশো টাকা করার আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করে দিলাম। গভর্নরের পক্ষ থেকে আমার ফ্যামিলি এলাউন্স বাড়িয়ে দেড়শো থেকে দুশো করা হলো। সাত মাসের এরিয়ারসহ সে টাকা পাঠিয়ে দেয়া হলো আমার স্ত্রীর নামে। এর আগেই অবশ্য আমার স্ত্রী বাপের বাড়ির সম্পত্তি বেঁচে ঈশ্বরদী স্কুল পাড়ায় ১০ কাঁঠা জমি কিনেছিলাম। সে জমির ওপর দুটো খড়ের দোচালা ঘর বানিয়ে আমি বাস করতাম। ফ্যামিলি এলাউন্সের এরিয়ারের টাকা দিয়ে টিন কিনে থাকার ঘরটি আমার স্ত্রী টিন দিয়ে ছেয়ে নিয়েছিলেন।

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা বলি। ঢাকা জেলে তখন বন্দি জীবনযাপন করছেন অনেক রাজনৈতিক ও কমিউনিস্ট নেতা। বিশিষ্ট লেখক ও শ্রমিকনেতা সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, নগেন সরকারসহ আরও অনেকে। জেলে তখন আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। রাজবন্দিদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা এর মধ্যেই আমরা আদায় করে ফেলেছি। জেলে সে সময় রাজবন্দিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই ছিলেন সে সব কমিটিতে। খাওয়া-দাওয়ার সুবন্দোবস্তের জন্য গঠন করা হয়েছিলো খাদ্য কমিটি। আর রাজনৈতিক কমিটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে বার্গেনিং-এ যেতেন। তো এই সময় একদিন সংবাদপত্রে খবর বেরুলো, আমার স্ত্রী সাংঘাতিক অসুস্থ সংবাদ পড়ে আমার মনটা ছটফট করতে লাগলো। কী করি? অবশেষে রাজনৈতিক কমিটির শরণাপন্ন হলাম। রাজনৈতিক কমিটি তখন তখুনি বসে গেলেন মিটিংয়ে। সিদ্ধান্ত হলো প্যারোলের জন্য আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে। আর দরখাস্ত না-মঞ্জুর হলে প্রয়োজনে হাঙ্গার স্ট্রাইক। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করে দিলাম। দরখাস্তে একথা উল্লেখ করলাম, আবেদন না-মঞ্জুর হলে, আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাবো। এই নোটিশ দেবার পরপরই অবশ্য কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তিনদিনের প্যারোল মঞ্জুর করা হয়েছে।

শনিবার সকালে একজন এ, এস, আই ও চারজন পুলিশ গার্ড সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠানো হলো ঈশ্বরদীতে। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা জেল গেট পর্যন্ত এসে আমাকে বিদায় দিয়ে গেলেন। বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। তেমন যদি দেখেন প্যারোলের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন। আমরা সব ব্যবস্থা করবো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে ট্রেনে চাপলাম ঢাকা থেকে। আমাদের ট্রেন যখন ময়মনসিংহে পৌঁছুলো, দেখি বেশ কিছু শ্রমিক-কর্মচারি জড়ো হয়েছেন স্টেশনে। ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, অনেক পরিচিত মুখ। এক সময় এক সঙ্গে কতো আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি আমরা। জানি না, কীভাবে খবর পেয়ে দলে দলে ছুটে এসেছে তারা আমার সাথে দেখা করার জন্যই। মনে মনে আনন্দ অনুভব করলাম, আমার আন্দোলনের সাথীদের এখানে এইভাবে দেখে, আমার প্রতি তাদের এতোখানি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ঘটনা দেখে।

অনেকে জানলার ধারে এসে আমার সাথে দেখা করতে চাইলে পুলিশ বাধা দিলো। দেখলাম তাদের কী আন্তরিকতা। তারা কোনো বাধাই না মেনে আমার সাথে কথা বললো, কুশল জিগ্যেস করলো। অনেকে আবার পাউরুটি এবং কলা ইত্যাদি কিনে এনে তুলে দিলো হাতে। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে এসে স্টিমারেও অনেকেই পুলিশের বাধা ঠেলে আমার সাথে আলাপ করে গেলো একইভাবে।

সিরাজগঞ্জ ঘাটে এসে দেখি শ্রমিক ভাইয়েরা মিছিল করে এসেছে আমাকে দেখার জন্য। এ-অঞ্চলে দীর্ঘদিন রেল শ্রমিকদের সাথে কাজ করেছি আমি। আজ যখন রেল শ্রমিকের খাতা থেকে আমার নাম কেটে বাদ দেয়া হয়েছে, তখনো তারা আমাকে মনে রেখেছে। এখানে বলে রাখা দরকার '৪৯-এ যখন আমি খুদ স্ট্রাইকের কারণে জেলে গিয়েছিলাম, তারপর ফিরে এসে, রেলে আর আমাকে জয়েন করতে দেয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বন্ড চেয়ে বসলেন, এরপর থেকে আমি আর কোনোরকম আন্দোলনে অংশ নেবো না। কিন্তু আমি বন্ড দিতে অস্বীকার করায় আমার আর চাকরি হয়নি। তবুও পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি শ্রমিক বেল্টেই কাজ করে যেতে লাগলাম। এখনো করছি তাই। যা হোক, সিরাজগঞ্জ ঘাটে মিছিল দেখে পুলিশ বেচারারা ঘাবড়ে গেলো খুব। তারা কিছুতেই শ্রমিকদের সাথে আমাকে দেখা করতে দেবে না। শ্রমিকরাও নাছোড়বান্দা। দেখা না করতে দিলে রেলের চাকা বন্ধ করে দেবে তারা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দেখা করতে দিতে রাজি হলো। অনেকক্ষণ আলোচনা হলো আমাদের। ট্রেন ছাড়ার সময় হলো। তবু কথার যেনো শেষ নেই। কতো খবর, কতো ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলো তারা প্রচণ্ড উৎসাহের্র সঙ্গে। ট্রেন ছেড়ে দিলো একসময়। যতোক্ষণ দেখা গেলো দেখলাম। মেহনতি মানুষগুলো প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আমাকে লক্ষ্য করে।

বিকেলের দিকে ট্রেন এসে পৌঁছুল ঈশ্বরদী প্লাটফরমে। আমার সেই চিরপরিচিত, চিরচেনা ঈশ্বরদী। অনেকদিন পর দেখলাম তাকে। প্লাটফরমে অনেক পরিচিত মুখ, আমাকে দেখে আগ্রহভরে দৌড়ে এলো ওরা। ওদের জিগ্যেস করলাম, কেমন আছে বাড়ির সবাই? তারা বললো, "সবাই ভালো, তবে আপনার স্ত্রীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা গতকাল পর্যন্ত খারাপ ছিলো। আজ একটু ভালো। ঈশ্বরদীর নওশের ডাক্তার দেখছেন। আমি বাড়ি যেতে চাইলে এ, এস, আই, জানালেন, 'সরাসরি আপনাকে বাড়ি নেয়ার তো অর্ডার নেই, আমরা আপনাকে পাবনা জেলে পৌঁছে দেবো আজই। তারপর আগামীকাল ডি, সি সাহেব আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। এটাই অর্ডার।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। বাড়ির কাছে এসে আমার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে পাবো না? কী আর করা, প্লাটফরমে পরিচিতজনদের বললাম, তোমরা একটু নওশের ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারো? আমার স্ত্রীর অবস্থা কেমন, একটু জেনে যাবো। তারা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলো। ডাক্তার আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "কোনো চিন্তা করবেন না। অবস্থা এখন ভালোর দিকে। আমি বলতে গেলে সব সময়ই রুগীর কাছে কাছে থাকছি। আপনি পাবনা চলে যান। অসুবিধা নেই।"

সে রাতটা আমাকে পাবনা জেলেই কাটাতে হলো। পরদিন সকালে ডি, সি সাহেবের সাথে দেখা করে বললাম, "আমার তিনদিনের প্যারোল রাস্তায়ই শেষ হলে গেলে আর অসুস্থ রুগী দেখবো কখন?" ডি, সি, সাহেব বললেন, 'চিন্তা করবেন না আপনি হিসেবে ভুল করছেন। নিয়ম হলো আপনি যেদিন বাড়ি পৌঁছুবেন সেদিন থেকে শুরু হবে আপনার প্যারোলের দিন। কাজেই বাড়িতে আপনি তিনদিনই থাকতে পারবেন। আমি আপনাকে এক্ষুনি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।" এরপর তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট আর পাঁচজন পুলিশ গার্ড সঙ্গে দিয়ে আমাকে ঈশ্বরদী পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকা জেলের পুলিশরা আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিলো।

বাড়ি এসে দেখলাম, পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছে। আমার আসার খবর তারা এর মধ্যেই শুনেছিলো। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার স্ত্রীকে তখন ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ডাক্তার সাহেব পাশেই বসে আছেন। আমার বড় মেয়ে ও জামাই ইদ্রিসও দেখলাম এসেছে আমার কথাবার্তার আওয়াজ শুনে জেগে উঠে আমার স্ত্রী বড় মেয়েকে জিগ্যেস করলো, "কে এসেছে?" মেয়ে বললো, "মা, দ্যাখো, খোকা এসেছে।" এখানে বলে রাখি, খোকা আমার 'টেক নাম' অর্থাৎ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকার সময় এই নাম ব্যবহার করতাম। তারপর থেকে আমার ছেলেমেয়েরাও এই নামেই আমাকে ডাকতো। আমার আসার কথা শুনেই দেখলাম স্ত্রীর কৃশকায় পাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুহূর্তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী পুলিশ বাহিনীর থাকা নিয়ে হলো সমস্যা। দু'খানা মাত্র চালাঘর আমার। তাদের থাকার ব্যবস্থা করি কোথায়? আমাকে ছেড়ে অন্য কোনোখানেও তো যাবে না তারা। অনেক ভেবেচিন্তে পাশের এক গার্ড সাহেবের বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা গেলো। পুলিশরা বললো, "দেখুন আমাদের চাকরি এখন নির্ভর করছে আপনার ওপর। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি। আপনি যদি পালিয়ে-টালিয়ে যান তাহলে আমাদের চাকরি থাকবে না।" বললাম, "কোনো চিন্তা নেই। আমি পালাবো না।" তবু রাতের মধ্যে কয়েকবারই তারা হাঁক-ডাক ছেড়ে জিগ্যেস করলো, "মণ্ডল সাহেব আছেন নাকি?"

দেখতে দেখতে আমার তিনদিনের প্যারোল শেষ হয়ে গেলো। এবার ফেরার পালা। বাড়িতে কান্নাকাটির রোল উঠলো। দু'একদিন পরেই ঈদ। প্রত্যেক ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার বইবে, অথচ আমি থাকবো না বাড়িতে। আমাকে ফিরে যেতে হবে জেলের ভেতরে। আবার সেই বন্দি জীবন শুরু হবে। আমারও মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। এর মধ্যেই আমার মেয়ে জামাই আর আত্মীয়স্বজন মিলে পরামর্শ দিলো, সামনে ঈদ। এ সময় পরিবার পরিজনদের সাথে ঈদ করার আবেদন জানিয়ে প্যারোলের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া যায় কি না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর আবেদন করা হলো গভর্ণরের বরাবর। ওদিকে দৈনিক 'সংবাদ'- এও আমার স্ত্রীর অসুস্থতা ও ঈদ উৎসব পালনের আবেদনের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্ট ছাপা হলো। তখন তো 'সংবাদ' পুরোপুরি আমাদের পক্ষেই কাজ করতো। এই রিপোর্ট ও আবেদনের প্রেক্ষিতে গভর্নরের কাছ থেকে টেলিফোন ম্যাসেজ এলো আমার প্যারোলের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্যারোলের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে কী হবে, পাকিয়ে উঠলো আরেক গোল। আমাকে পাহারা দিতে গেলে পুলিশদের আর ঈদ করা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে আমাকে বরলেন, "আপনি যদি অঙ্গীকার পত্র দেন যে পালাবেন না, তাহলে পুলিশদের ছুটি আমি মঞ্জুর করতে পারি। বেচারাদের ঈদ করা-না করা নির্ভর করছে এখন আপনার ওপর।" আমি বললাম, "ওদের ছেড়ে দিতে পারেন। আমি অঙ্গীকারপত্র লিখে দিচ্ছি। পুলিশরা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো। তবে, লোকাল পুলিশ আর ডি.আই. বি কিন্তু আমার পিছু ছাড়লো না। এমন কি ঈদের মাঠেও তারা নামাজ পড়লো আমার পাশে বসেই। ক'দিন হৈ-হুল্লোড়ের ভেতর দিয়ে কোথা দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেলো টের পেলাম না। যাওয়ার দিন আবার সেই কান্নাকাটি। অনেকে অনেক রকম হিতোপদেশ দিলো। বিশেষ করে জেলের ভেতর যাতে কোনো রকম গণ্ডগোল না বাধাই, সবাই সতর্ক করে দিলো সে ব্যাপারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এলাম জেলখানায়। এর কিছুদিন পরই আবার আমাকে বদলি করা হলো রাজশাহী জেলে। রাজশাহীতে আসার সপ্তাহখানে পরই আমার রিলিজ অর্ডার এসে গেলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক নতুন ফ্যাঁকড়া বাধিয়ে বসলেন। জেল থেকে বেরুবার আগে বন্ড সই করে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আমি যাতে কোনো রকম রাজনীতি না করি এরই রকম অঙ্গীকারপত্রে সই করতে হবে। আমরা রাজবন্দিরা বেঁকে বসলাম। বন্ড আমরা কিছুতেই দেবো না। বন্ড দিয়ে রিলিজ হতে চাই না। জেদের মুখে শেখ পর্যন্ত বিনা বন্ডেই মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন কর্তৃপক্ষ।

রাজনীতির পানি এর মধ্যে বহুদূর গড়িয়েছে। ছাপান্নোয় এসে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হলো। আর যে বাংলা ভাষার জন্য এতো রাক্তারক্তি, সে ভাষাও স্বীকৃতি পেলো পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো পূর্ব পাকিস্তান। আওয়ামী লীগ এ সময়ই কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রে ও পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন হলো। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন আতাউর রহমান খান। পাশাপাশি প্রায় এ সময়ই বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগে বিভেদ দেখা দিলে মওলানা ভাসানী বেরিয়ে এসে গঠন করলেন একটি স্বতন্ত্র দল। নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। বোধ করি সালটা ছিলো ১৯৫৭। নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এ সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সেল্টারে কাজ করতে শুরু করেন। তারপরেই তো ১৯৫৮ সাল। ইতিহাস-কলঙ্কিত স্বৈরাচার আয়ুব শাহীর কালো দশকের সূচনার সাল। এ সময়কার একটা ঘটনার কথা এখনো স্মরণে আছে। আমি তখন ঈশ্বরদীর বাড়িতেই বসবাস করছি। একদিন সকালে লোকো শ্রমিকদের একজন ছুটতে ছুটতে এসে দরজায় কড়া নাড়লো। দরজা খুলে দিতেই হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো, "আপনি এখনো ঘরে বসে আছেন? শোনেননি? ইস্কান্দার মির্জা শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে সামরিক আইন জারি করেছে? জেনারেল আইয়ুব খান সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়েছে।" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল সে। আমি বললাম, "কোথায় শুনলে? আমি তো কিছুই জানি না!" সে বললো, "কেনো রেডিওতে বারবার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে আপনার বোধহয় বাড়িতে থাকা ঠিক নয়, এক্ষুণি সরে পড়ুন কোথাও।"

চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই এখন এই দিনে-দুপুরে কোথায় পালাই? মনে মনে বেশ কিছুক্ষণ কয়েকটি বাসার কথা চিন্তা করলাম, কিন্তু কোনোটাকেই তেমন নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য মনে হলো না। শেষে একজন গার্ডের বাসার কথা মনে হলো। যেখানটায় গিয়ে সেল্টার নেয়া যায়। ঈশ্বরদী স্টেশনের পশ্চিম পাশের কলোনির একেবারে ভেতরের দিকে বাসাটি। সবচাইতে বড় সুবিধে, গার্ড সাহেব ইউপি'র লোক। উর্দু মেশানো তার কথাবার্তা। সবাই বিহারি বলেই জানে। তা'ছাড়া গার্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের শ্বশুর অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সেই সুবাদে গার্ড সাহেবের স্ত্রীও আমাকে যথেষ্ট খাতির আত্তি করতেন। ও বাসায় থাকলে কেউই আমাকে সহজে সন্দেহ করবে না। আর বিহারি বাসা বলে কারুর নজরও যাবে না সেদিকে।

তখন তখুনি প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় আর সন্দেহজনক বইপত্র একটা ব্যাগে পুরে নিয়ে রওয়ানা হলাম গার্ড সাহেবের বাসার উদ্দেশে। আমার স্ত্রীকে শুধু জানিয়ে গেলাম, "ঈশ্বরদীতেই থাকবো, বেশিদূর যাবো না।"

গার্ড সাহেব বাসায়ই ছিলেন। আমার সমস্যার কথা শুনে বললেন, "কোনো অসুবিধে নেই, যতোদিন ইচ্ছে থাকুন। গার্ড সাহেবের স্ত্রী ও যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আপনি আমার বাবার সাথে কাজ করেছেন, আজ আপনার বিপদে আমরা এটুকু করবো না? নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আপনারা কোনো অসুবিধে না হলেই হলো। বাসায় আর কেউ নেই।"

গার্ড সাহেব, তার স্ত্রী আর আট-ন' বছরের একটি ছেলে। আমি সুবিধামতো সেই বাসাতেই থাকতে লাগলাম। সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকি। বইপত্র পড়ি। রাতে বেরিয়ে পড়ি বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। তখন আমাদের শক্তিশালী সংগঠন ঈশ্বরদী লোকো এলাকায়। ওখানে কমরেড শাহাবুদ্দিন, আজিজ খান এবং আরও অনেকেই রয়েছেন। তাঁদের কাছে গেলে মোটামুটি খোঁজখবর পাওয়া যায়। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা হয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। ঈশ্বরদী লোকোসেড এলাকটি এতো ঘনবসতিপূর্ণ যে পুলিশ রেড করলেও কারো সন্ধান পাওয়ার জো নেই। তা'ছাড়া ওখানে গিয়েই শুনলাম, সমস্ত রাজনৈতিক ও শ্রমিকনেতার নামেই হুলিয়া বেরিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকহারে ধরাপাকড় শুরু হয়েছে। তখন হুলিয়ার খবর কীভাবে যেনো বেরিয়ে পড়তো। আমরা আগেভাগেই টের পেয়ে যেতাম কার কার নামে হুলিয়া হয়েছে। মোটামুটি এভাবেই কাটছিলো আণ্ডার গ্রাউন্ডের দিনগুলো। হঠাৎ একদিন ঈশ্বরদীর ওপর বিমান থেকে লিফলেট ছাড়া হলো। আয়ুব খাঁর সতর্ক বাণী। গার্ড সাহেবের ছেলে কুড়িয়ে পেয়ে ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলো বাসায়। তার মা ডেকে বললেন, "কিরে, কি ওটা?" ছেলে বলল, "প্লেন থেকে ফেলেছে। পড়ো না মা, কী লেখা আছে ওতে!" আমি পাশের ঘরে বসে বসে মা-ব্যাটার কথা শুনছিলাম এতোক্ষণ ধরে। মা লিফলেট পড়া শুরু করতেই আমার মনোযোগ আরও বেশি করে নিবিষ্ট হলো সেদিক পানে। গার্ড সাহেবের স্ত্রী জোরে জোরে পড়ছিলেন, কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে কেউ যদি বাড়িতে স্থান দেয় অথবা কারো বাড়ি থেকে যদি কোনোরকম আপত্তিজনক কাগজপত্র, বই অথবা প্রচারপত্র পাওয়া যায়, তবে তাকে চোদ্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের কারাদন্ড দেযা হবে। এ পর্যন্ত পড়া হতেই আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। জিগ্যেস করলাম, "কি পড়ছ তোমরা মায়ে-ব্যাটাতে?" গার্ড সাহেবের স্ত্রী লিফলেটখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন।" আমি পড়ে দেখলাম, আইয়ুব খান আরও অনেক হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে সে লিফলেটে। বললাম, "এরপর তো তোমাদের এখানে আর থাকা যায় না। আমার জন্য তোমরা বিপদে পড়ো এটা আমি চাই না।" গার্ড সাহেবের স্ত্রী বললেন, "আপনি চিন্তা করবে নাতো? কিচ্ছু হবে না। ও রকম লিফলেট কতোই তো ছাড়ে। হয় কিছু? আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন এখানে।"

গার্ডের স্ত্রী আশ্বাস দিলে কি হবে? গার্ড সাহেব কিন্তু সব শুনেটুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি এসেই স্ত্রীর সাথে শলাপরামর্শ শুরু করলেন, "সরকারের এই হুঁশিয়ারির পর ওঁকে আর কিছুতেই রাখা যায় না এখানে।" গার্ডের স্ত্রী বললেন, "কিছুই হবে না, তুমি চুপ করতো। ও ঘরে উনি শুনতে পাবেন।"

এবার দেখলাম গার্ড সাহেব রেগেই গেলেন। বললেন, "দ্যাখো আমি সরকারি চাকরি করি, আমার চাকরির ক্ষতি হোক, এটা কি তুমি চাও?।" ওদের বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গার্ড সাহেবকে বললাম, "আপনারা ঘাবড়াবেন না, আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। আমার জিনিসগুলো রইলো, রাতে এসে নিয়ে যাবো।" তিনি দেখলাম আমার জিনিসপত্র রাখতেও রাজি নন। বললেন, "রাতে আসবেন! আমি তার চেয়ে ওগুলো বাইরে রেখে দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন। বোঝেনই তো লিফলেটে লিখেছে ঘরে কোনো আপত্তিজনক কাগজপত্র রাখা যাবে না। আমার চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে!" গার্ড সাহেবের স্ত্রী এবার রেগে গিয়ে স্বামীকে বললেন, "তুমি মানুষ না আর কি? ও জিনিসপত্র বাসায়ই থাকবে। আপনার যখন ইচ্ছে নিয়ে যাবেন। আমি বের করে দেবো।" আমি ওদের কাছ থেকে একটি ঝুড়ি আর কিছু তরিতরকারি চেয়ে নিলাম। জামাকাপড়গুলো ব্যাগে ভরে শুধু লুঙ্গি পরে মাথায় গামছাটা বেঁধে নিলাম। তারপর তারকারি ঝুঁড়ি মাথায় নিয়ে সাধারণ চাষাভুষোর মতোই রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সেদিন ছিল হাটবার। অরনখোলার হাট। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেকেই হাট করতে এসেছে। এখন ফিরে যাচ্ছে কেউ কেউ। আমাকেও ঠিক হাটুরেদের মতোই মনে হচ্ছিলো।

কলোনির শেষ সীমানায় এসে দেখি, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাথায়! আমার তো দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কী ব্যাপার! পুলিশ জেনে ফেললো নাকি? রাস্তা ঘেরাও করে বসে আছে কেনো? একটি বাচ্চা মতো ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ডেকে জিগ্যেস করলাম, "খোকা ওখানে কি হয়েছে? পুলিশ কেনো? ছেলেটি বললো, "গতরাতে ওই বাসায় চুরি হয়েছে। তাই পুলিশ এসেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক তবু বাঁচোয়া! আমাকে আবার বেরিয়ে যেতে হবে ওই রাস্তা ধরেই। আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে গেলাম। মাথার গামছাটা মুখের ওপর আরো একটু নামিয়ে নিলাম। পুলিশের কাছাকাছি হতেই বুঝলাম, আমাকে ওরা চেনে নি। দুই পুলিশ একমনে গুলতানি মারছিলো। আমাকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে বুঝি অভ্যেসবশতই একজন জিগ্যেস করলো, "এই ব্যাটা বাড়ি কোথায়? যাচ্ছিস কোথায়?

বিনয় করে বললাম, "বাড়ি স্যার মাজদিয়া গ্রামে, হাট করে ফিরছি।"

ওরা আর কিছু বললো না। আমি সোজা পিয়ারপুরের রাস্তা ধরে মাজদিয়ার দিকে রওয়ানা হলাম। যেতে যেতে বেলা প্রায় ডুবে এলো। মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলো আমাকে ভালো মতো চেনে সে। দেখেই ধরে ফেললো, আমি কোথাও পালাচ্ছি। বললো, "কি মন্ডল সাহেব আজ কোথাও জায়গা পান নি নাকি?" বললাম, "শহরে থাকা সম্ভব নয়, তাই গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি। দেখি কোথাও জায়গা পাওয়া যায় কি না।" সে বললো, "খাওয়া-দাওয়া ও হয় নি মনে হয়? মুখ শুকিয়ে আছে? চলেন, আমার ওখানে চলেন। কিছু মুখে দিয়ে যাবেন।" সে প্রায় জোর করেই আমাকে তার বাড়ি নিয়ে চললো। আমার ফেরার জীবনে দেখেছি শহরের চাইতে গ্রামের মানুষজনই যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়ে দিনের পর দিন আমাকে আগলে রেখেছে। অভাবি মানুষগুলো নিজেরা দু'বেলা না খেতে পেলেও, আমাদের ঠিকমতোই আহার যুগিয়ে গেছে।

তো সেই পরিচিত লোকটির বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সন্ধ্যা তখন প্রায় ঘোর ঘোর। দেখলাম, তার স্ত্রীও আমাকে চেনে। বললো, মরিয়াম বুবুর দামাদ না? আমি চিনি আপনাকে। রাতে আর কোথায় যাবেন? এখানে খেয়েদেয়ে শুয়ে থাকেন।

রাতটা কাটিয়ে দিলাম ওই বাড়িতেই। দিনটাও ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আবার শহরে ফিরে লোকোসেডে গেলাম আহাদ আলীর সাথে যোগাযোগ করবো বলে। আহাদ আলী ছিলেন তখনকার করিতকর্মা শ্রমিক কর্মী। যেকোনো সমস্যা নিয়ে আহাদ আলীর কাছে গেলে তার একটা সমাধান হবেই বলে সবাই আশা করতো। কেন্দ্রীয় নেতা আসছেন, থাকার ব্যবস্থা কে করবে? আহাদ আলী। কোনো শ্রমিকের মাসের চাল ফুরিয়ে গেলে দোকান থেকে বাকি করে এনে দেবে কে? আহাদ আলী। কোনো কর্মীর ছেলে বা মেয়ের একসিডেন্ট কিংবা অসুখ হলে হসপিটালে দৌড়ুবে কে? সেখানেও সেই আহাদ আলী। এককথায় আহাদ আলী যেনো সকল কাজের কাজি। এক সময় জ্যোতি বসু নিজেও আহাদ আলীর বাসায় থাকতে পছন্দ করতেন বেশি। কারণ ওই বাসায় থাকলে নাকি তাঁর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুরই অসুবিধে হতো না। কতোদিন যে আহাদ আলীর বউ জ্যোতি বসুর জন্য রুটি বানিয়ে দিয়েছে, তার ঠিক নেই। এখনো আছে সেই মহিলা। জ্যোতি বসুর নাম শুনলে এখনো তার মুখে গল্পের ফোয়ারা ছোটে।

আহাদ আলীর বাসায় গিয়ে দেখলাম, তার স্ত্রী নেই, দামুকদিয়া দেশের বাড়ি গেছে। বাসায় সে একা। আমাকে দেখেই বললো, "কি ব্যাপার জসীম ভাই? এতো রাতে?" বললাম, "আয়ুব খাঁর লিফলেটের কথা শোনো নি?" সে বললো, শুনেছি তো আমি আপনার খোঁজ খবর করে বাসায় পাইনি। কোথায় ছিলেন?" বললাম, "ছিলাম এক বাসায়। তবে এই লিফলেট পড়ার পর তারা ভড়কে গেছে। কিছুতেই আর বাসায় রাখতে চাইলো না। তাই চলে এলাম এখানে।" আহাদ আলী বললো, "ভালোই করেছেন। আমার এখানে খুব একটা অসুবিধে নেই। এখানেই থেকে যান। তবে দিনের বেলা বাইরে না বেরুলেই হলো।"

রাতে সে রুটি তৈরি করলো নিজেই। দু'জন মিলে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। সকাল বেলা উঠে কিন্তু আমাকে বাইরে বেরুতেই হলো। কারণ আহাদ আলী যে ব্যারাকে থাকে সেখানে আলাদা কোনো পায়খানা নেই। বাসার সামনে বাইরে বারোয়ারি পায়খানা। সবাই সেটা ব্যবহার করে। সকালবেলা উঠে তাই সেই পায়খানার দিকেই ছুটতে হলো। ফলে আমাকে পাড়ার সবাই দেখলো। তখন তো আমি অতি পরিচিত শ্রমিকনেতা। তাই ভয় হতে লাগলো আবার জানাজানি না হয়ে যায়। আহাদের ডিউটির সময় হলো। আমাকে নাস্তা বানিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ডেকে বললাম, "তোমার এখানে বোধহয় আমার বেশি দিন থাকা সম্ভব হবে না। তোমাকেও তো পুলিশ চোখে চোখে রাখবে। তোমার বাসা রেড হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তুমি বরং আজিজ খানকে ডেকে আনো, দেখি ওর বাসায় থাকা যায় কি না। আজিজ খান বিহারি। ওর বাসায় থাকলে পুলিশ মোটেই সন্দেহ করবে না। আজিজ খান আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কাজেই নিরাপদেই থাকতে পারবো ওখানে।"

আহাদ আলী বললো, "ঠিক আছে, আমি সেডে যাওয়ার পথে আজিজ খানকে খবর দিয়ে যাচ্ছি, আপনার সাথে যাতে ও দেখা করে।" আহাদ আলী চলে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আজিজ খান এসে হাজির হলো। বলো, "জসীম ভাই, হাম আহাদ কা পাছ সব কুছ শুনা। আপ হামারা ঘরমে আ যাইয়ে, হাম সব বন্দোবস্ত কর দেগা।"

বললাম, "আমি সন্ধ্যাবেলাতেই তোমার ওখানে আসছি।" সে চলে গেলো। দুপুরবেলা আহাদ এসে রান্না চড়ালো। আমাকে বললো, "আপনি একটু এদিকে দ্যাখেন। আমি মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে আসছি।" কিন্তু আহাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে গেলো সিগারেট আনতে আর আসে না। প্রায় ঘন্টা পেরিয়ে গেল তবু তার ফেরার নাম নেই। এ দিকে ভর দুপুর বেলা। টিফিনের সময়। আমি বাইরে বেরিয়ে খোঁজখবরও করতে পারছি না। ঠিক এই সময় দরজার কড়া বেজে উঠলো। দরজা খুলেই দেখি একটি ছোট্ট মেয়ে। ভেতরে এসে সে ফিসফিস করে বললো, "চাচা, মা বললো, আহাদ চাচাকে পুলিশ ধরেছে। বাইরে পুলিশ থই থই করছে। আপনাকে পালাতে বললো"। শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো, এখন কি করি"? মেয়েটিকে বললাম, "তুমি কোন বাসায় থাকো?" সে বললো, "ওই তো এক বাসা পরে।" "তোমার মা'কে একটু ডেকে আনো, বলবে চাচা ডাকছে।"

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর তার মা এসে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বললো, "আমাকে ডেকেছেন ভাই?"

বললাম, "ভাবী দরজার আড়ালে থাকলে আর চলছে না। আপনি একটু সামনে আসেন। কথা আছে।"

মহিলা আমার কথামতো সামনে এসে দাঁড়ালো। বললাম, "আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তা'হলে আমি এখান থেকে পালাতে পারি। তা না'হলে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবো।"

সে বললো, "কি করতে হবে, তাই বলুন?" বললাম, "আপনাকে একটু মেয়ের মা সেজে আমার সাথে গল্প করতে করতে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, যাতে পুলিশ মনে করে, আমরা স্বামী-স্ত্রী গল্প করতে করতে যাচ্ছি। ফলে, পুলিশ সন্দেহ করবে না। তারপর পুলিশের চোখে আড়াল হলেই আমি পালিয়ে যাবো। আপনি চলে আসবেন।"

মহিলা একটু লজ্জা পেলো যেনো। বললো, "আচ্ছা তাই করুন। তবে দেরি করবেন না। পুলিশ হয়তো বাসা বাসায় খুঁজতে শুরু করবে এরপর।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মহিলার সহজে রাজি হওয়ার ব্যাপারটা দেখে। তখন তো মেয়েদের সাংঘাতিক পর্দার ব্যাপার ছিলো। অথচ এই মহিলা আমার পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে সব লজ্জা–শরমকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে। তার সাথে যে আগে থেকে কোনোরকম জানা-পরিচয় ছিলো, তাও না। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের জন্য এতো বড় ঝুঁকি কে নেয় এ-যুগে!

পরিকল্পনা মতো আমি মেয়েটির হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। বাসায় তালাচাবি মেরে মহিলা এসে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো। আমরা এমনভাবে আলাপ করতে করতে এগুতে লাগলাম, যেনো আমরা স্বামী-স্ত্রী কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি! রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা কোনোরকম সন্দেহই করলো না। কয়েকটা ব্যারাক পেরিয়ে এলাম এমনি করে। রেললাইনের ধারে শেষ ব্যারাকটার পরই কয়লা ডিপো। ব্যারাকের পাশেই বিরাট চওড়া একটা নর্দমা। কয়লা ডিপোতে পাশাপাশি বিশাল কয়লার স্তূপ। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। কয়লা ডিপো পেরুলেই রেললাইন। রেল-লাইনের পশ্চিমের কলোনিতেই আজিজ খানের বাসা। তো শেষ ব্যারাক পার হওয়ার পরই আমি দিলাম কষে দৌড়। এক লাফে নর্দমা পার হয়ে কয়লা ডিপোতে ঢুকে পড়লাম। এর মধ্যেই মোড়ে দাঁড়ানো পুলিশ দেখে ফেলেছে আমাকে। তারা 'ধর, ধর পালালো' বলে ছুটে আসছে পেছনে পেছনে। কয়লা ডিপোর পাহারাদাররা আমার পরিচিত। একজন বলে উঠলো, "জসীম ভাই দৌড়ান কেনো? কি হয়েছে?" বললাম, "পেছনে পুলিশ আসছে।"

তারা বললো, "আপনি এ-পাশ দিয়ে রেললাইনের দিকে চলে যান। আমরা পুলিশ এলে অন্য রাস্তা দেখিয়ে দেবো।" আমি ছুটতে ছুটতে এসে রেল লাইনে উঠলাম। সেখান থেকে পশ্চিমের রেল কলোনিতে। পুলিশ কয়লা ডিপোর গোলকধাঁধায় ঘুরতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে আজিজ খানের বাসায় এসে দেখি, সে বাসায়ই আছে। আমাকে দেখেই স্ত্রীকে ডেকে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললো। আমি তখন সমানে হাঁপাচ্ছি। আজিজ খান জিগ্যেস করলো, "কিয়া হুয়া জসীম ভাই?" বললাম, "অল্পের জন্য ধরা পড়তে গিয়ে বেঁচে গেছি।" বাসার ভেতরের দিকের ঘরটি আমাকে ছেড়ে দিলো তারা। এরপর থেকেই ওখানেই থাকতে লাগলাম।

আজিজ খানের বউ ছিলো খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাকে কোনোক্রমেই ঘরের বার হতে দিতো না সে। বাইরের কল থেকে পানি এনে দিতো আমার গোসলের জন্য। এমন কি আমার ভেজা কাপড়গুলোও উঠোনে শুকোতে দিতো না। কয়লার চুলোর ওপর ধরে ধরে শুকিয়ে দিতো।

একদিন দেখি কতোগুলো শিশিতে রঙিন পানি ভরে তাতে কাগজ কেটে কেটে দাগ লাগাচ্ছে। বললাম, কি করছ বোন? সে উত্তর দিল 'ওষুধের শিশি বানাচ্ছি। বানানো হলে ওষুধের শিশিগুলো সে আমার ঘরের দরজার কাছে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো। মেহমান কেউ এলেই আমাকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে বলতো। মেহমানদের বলতো, "আমার দেশোয়ালী ভাই। ভীষণ অসুস্থ হয়ে এসেছে বাসায়।" দরজার সামনে ওষুধের শিশি দেখে তারা তাই বিশ্বাস করতো। পালিয়ে থাকবার সময় দেখেছি, আমাকে যারা সমস্ত বিপদআপদ অগ্রাহ্য করে আশ্রয় দিতো, আমাকে নিরাপদে রাখবার জন্য তারা কতো রকমের কৌশলই না অবলম্বন করতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুবের কালো দশক

১৯৫৮ সালে বিমান থেকে লিফলেট বিলি করে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও কর্মীদের সতর্ক করে ক্ষমতায় এসে কালো দশকের উদ্বোধন করলেন আইয়ুব খান। সে দশকের নানান ঘটনা নানান তিক্ত স্মৃতি আজো প্রতিটি বাঙালির মনে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আইয়ুবী দশকে বাঙালিকে নিয়ে যে প্রহসন চালানো হয়েছিল, তার নজির সম্ভবত ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না।

শ্রমিকদের টেউ ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নির্লজ্জ হামলা চালিয়ে, ইসলামের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পূর্ব বাংলাবাসীর ওপর চললো চূড়ান্ত পীড়ন ও অত্যাচার।

কিন্তু এসব অনাচারের মুখে বাঙালি জাতি বেশিদিন চুপ করে থাকলো না। ১৯৬২ সালে যখন করাচিতে আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলো, তাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার মানুষের বিগত চার বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। গণআন্দোলন দানা বাঁধতে লাগলো দেশ জুড়ে। প্রথমে ছাত্র সমাজ আন্দোলন সূচনা করলেও পরে শ্রমিক-কর্মচারীরাও এগিয়ে এসে হাল ধরলেন সেই আন্দোলনের।

আইয়ুব খান এ-সময় এক নতুন তেলেসমাতি দেখালেন। আন্দোলন দমন করতে আশ্রয় নিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। আমি তখন রাজশাহী জেলে। জেলখানায় বসে বসেই খবর পাচ্ছি দেশ জুড়ে দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা চলছে। এখন তো হরহামেশাই আইয়ুবের ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে জেলে রাজনৈতিক বন্দিরা আসছেন। তাদের কাছে খবর পেতাম সাম্প্রদায়িক তৎপরতার। এ সময় বিহারি শ্রমিকরা এই দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিলো বেশি। তবে বাঙালি গুণ্ডারাও কম যায়নি। ঈশ্বরদী, পাবনা ও চাটমোহর এলাকার বহু হিন্দু পরিবার এই সময়ে তাঁদের সর্বস্ব ফেলে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে দাঙ্গা-বিরোধী কমিটি গঠন করে দাঙ্গার বিপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে আইয়ুবের এই জঘন্য কৌশল ব্যর্থ করে দেয়া হয়।

এরপর প্রবল গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান নির্বাচন দিতে বাধ্য হলে সেখানেও খাটালেন আর এক তেলেসমাতি। চালু করলেন তিনি বুনিয়াদি গণতন্ত্র। আশি হাজার বুনিয়াদি গণতন্ত্রী আগে নির্বাচিত হবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে, পরে তারাই নির্বাচন করবেন দেশের প্রেসিডেন্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সময় পুলিশকে ঘুষ দিয়ে জেলের ভেতরে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের একটা নতুন কৌশল আমরা উদ্ভাবন করেছিলাম। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে যান। তাই জেলগেটের পুলিশদের জামাকাপড় খুলে তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হতে লাগলো তখন থেকে।

১৯৬৪ সালের দিকে মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচনের পাঁয়তারা শুরু হলো জোরেশোরে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন জিন্নাহ সাহেবের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। আমরা জেলে বসেই খবর পেতে লাগলাম মিস জিন্নাহর প্রতি জনতার ব্যাপক সমর্থনের বিষয়ে। রাজবন্দিদের মধ্যে উৎসাহের ঢল নেমেছে তখন। কেউ কেউ বলছেন, "এবার জিন্নাহকে ঠেকায় কে?" বিজয় তাঁর নিশ্চিত। আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছিলো। কারণ সেই বুনিয়াদি গণতন্ত্রের তেলেসমাতি। আমার মন বলছিলো মিস জিন্নাহ কিছুতেই জিততে পারবেন না। জিততে তাঁকে দেয়া হবে না। কারণ আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী, যারা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হবেন, তাদের কিনতে কতোক্ষণ? এ সময় জেলখানার ভেতরে মিস জিন্নাহর জেতা-হারার বিষয় নিয়ে প্রতিদিনই বিতর্কের আসর বসতো। রাজবন্দিদের মধ্যে উভয় দলই যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের পার্টি এ-সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তা জানার জন্য আমরা খুব গোপনে পুলিশকে দিয়ে 'বড় ভাই' (মনি সিংহ)-এর কাছে একটি চিরকুট পাঠালাম। মণি সিংহ তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। পার্টি কর্মীদের মারফত এর জবাবে ক'দিন পরেই একটি ছোট্ট কাগজ এসে পৌঁছলো আমাদের হাতে। তাতে লেখা 'আইয়ুব খান জিতবেই।" কথাটা আজও আমার মনে আছে। আর হলোও তাই। বিপুল জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে মিস জিন্নাহ হেরে গেলেন। তবে তিনি পূর্ববাংলার নোয়াখালি জেলা থেকে সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছিলেন এই নির্বাচনে।

এর পরপরই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেখলাম, আমার কথাই ফলেছে। আইয়ুব খান কিনে নিয়েছেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের। ভোট নেয়ার জন্য তিনি অনেক বি. ডি. মেম্বারকেই এ সময় হোন্ডা ফিফটি মোটর মাইকেল ঘুষ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরদী এলাকার অনেক বি. ডি. মেম্বারকে লোকে ঠাট্টা করে তখন বলতো, আইয়ুব শাহির আশি হাজার ফেরেস্তা!

মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের পরপরই শুরু হয়ে গেলো এর মাহাত্ম্য প্রচারের পালা। হাজার হাজার প্রচার পুস্তিকা বেরিয়ে গেলো রাতারাতি। তাতেই কি আইয়ুব খানের সন্দেহ যায়? বাঙালি মূর্খরা পাছে এর মাহাত্ম্য না বুঝে ভুল করে বসে সেই আশঙ্কায় রেডিওতেও সন্ধ্যা লাগতে-না-লাগতেই বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর চালু করা হলো। 'মজিদের মা' নামে এক বেহায়া মহিলা, নানান রঙে-ঢঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সুফল বিশ্লেষণ করতে লাগলেন জনগণের কাছে। আর এক বেহায়া পুরুষপুঙ্গব তখন আসর জমিয়ে বসেছিলো, নাম আসাফউদ্দৌলা। আমি এখনো মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে কালো দশকের কথা উঠলেই এই বেহায়া মজিদের মাকে একবার স্মরণ করি। এভাবেই প্রকৃত গণতন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে তার নিজের বুনিয়াদটি ভালোভাবেই শক্ত করেছিলেন আইয়ুব খান।

১৯৬৩ সালে জেলখানার ভেতরেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ভেতরে আমদানি হলো এক নতুন বাদ-মাও সেতুং-এর মাওবাদ। তখন পার্টিতে বিপ্লবী সব নতুন নতুন কমরেড এসেছেন। রক্তগরম তাঁদের, সর্বক্ষণই বিপ্লবের বুলি কপচাচ্ছেন। আলাউদ্দিন, মতিন, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আবদুল হক আর তোয়াহা বিপ্লবের নেশায় টগবগ করে ফুটছেন যেনো। মাওসেতুং-এর লাল বই তখন তাদের ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, পূর্ববাংলায় বিপ্লবের পরিস্থিতি বিরাজ করছে ইত্যাদি। অতএব সশস্ত্র সংগ্রাম আসন্ন।

অপরপক্ষে পোড়-খাওয়া প্রবীণ কমরেডরা বললেন, ধীরে চলো সখা, রুগীকে চা-চামচ দিয়ে ওষুধ খাওয়াও, চা-চামচের বদলে ডাল-তোলা চামচ দিয়ে ওষুধ খাওয়ালে রুগী মরবে যে! যে পূর্ববাংলার মানুষ এখনো গণতন্ত্রের স্বাদই চোখে দেখলো না, তাদেরকে তুমি যাচ্ছো সমাজতন্ত্র গেলাতে? এটা কি করে সম্ভব?

অতি বিপ্লবীরা আমাদের আখ্যায়িত করলেন, 'সংশোধনবাদী", "সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল" বলে। এভাবেই পার্টির মধ্যে বিভেদ দানা বাঁধতে লাগলো। ঠিক এ সময়ই শুরু হলো আইয়ুব খানের আর এক তেলেসমাতি।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর নিয়ে শুরু হয়ে গেলো ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। স্বৈরাচারী আইয়ুবের রেডিও কোমর বেঁধে লেগে গেলো অন্ধ ভারত-বিরোধী প্রচারণায়। জেহাদ শুরু হয়ে গেছে, কাফের ধ্বংস করো, আর সেই সাথে তো আছেই আইয়ুবের ভাড়াটে পত্রিকা বাহিনী। তারাও যেনো পারে তো রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দিকে চীনতো মুখিয়েই ছিলো। সুযোগ বুঝে চীনা রেডিও কেরোসিন ঢালতে লাগলো জেহাদের আগুনে। এই উগ্র যুদ্ধংদেহী প্রচারণা পূর্ব বাংলার মানুষকেও সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করে তুললো। এ সময় ন্যাপের কিছু কর্মী, এমন কি পার্টির কিছু কর্মীও যুদ্ধ উন্মাদনায় মেতে উঠলো। কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে "যুদ্ধ বন্ধ ও আলোচনা-সমঝোতার" মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহবান জানিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করলো।

মওলানা ভাসানীর সাথে আমরা তখন দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে অবিরাম মিটিং করে চলেছি। দিনাজপুরের তেতুলিয়া থেকে শুরু করলাম প্রচার সভা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের মধ্যে তখন যুদ্ধ উন্মাদনা থাকলেও, যুদ্ধের ফলে বাজারদর চড়ে যাওয়ায় যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে ক্রমশ। আমরা যুদ্ধের কুফলগুলোই মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

তেঁতুলিয়া থেকে শুরু করে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বোদা, নবাবগঞ্জ, শিবপুর, রাজবাড়ি-একের পর এক মিটিং চলছে। আমাদের সাথে আছেন কৃষকনেতা হাতেম আলী খান, হাজী দানেশসহ আরো অনেকে। ন্যাপের মশিউর রহমানও (যাদু মিয়া) মাঝে-মাঝে মিটিং-এ থাকেন, তবে তার প্রতি ভাসানী সাহেবের কেমন যেনো বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করতাম। ভাসানী সাহেব তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। একবার এক মিটিংয়েতো মওলানা সাহেব বলেই ফেললেন, "চাউলের দাম বাড়িয়েছে, তেলের দাম বাড়িয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুর দামই বাড়িয়েছে, তবে মদের দাম বাড়িয়েছে কি না যাদু বলিতে পারে।" বলাবাহুল্য যাদু মিয়া তখন মঞ্চে উপস্থিত।

রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত একটা মিটিংয়ের ছোট্ট ঘটনা বলি। রাজবাড়ি ফুটবল মাঠে মিটিং চলছে। দেখি আইয়ুব খানের ফটো হাতে ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে দলে দলে লোক আসছে মিটিংয়ে। বোঝা গেলো, তারা মনে করেছে এই মিটিং যুদ্ধের পক্ষেরই। আমরা যেনো কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। জনতার এই যে উন্মাদনা, এর বিরুদ্ধেই তো আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে হবে? জনতা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে, আমাদের কেবল একটাই চিন্তা। মওলানার কিন্তু দেখলাম সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। একটা 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব নিয়ে তিনি বসে আছেন সভাসঞ্চে। সবসময়ই দেখেছি মওলানা ভাসানীর মধ্যে কেমন যেনো একটা সম্মোহনী শক্তি ছিলো। মানুষকে কথার জাদুতে বশীভূত করার সত্যিই এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিলো তার।

আমাদের কাউকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন। শুরু করলেন তাঁর অনলবর্ষী বক্তব্য। দেখলাম ধীরে ধীরে জনতার ভারত-বিরোধী যুদ্ধ-উন্মাদনা মিইয়ে আসছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তিনি স্বৈরাচারী আইয়ুবের কলা-কৌশল আর যুদ্ধের কুফল ইত্যাদির বর্ণনা করে চললেন তার সেই চিরাচরিত সম্মোহনী ঢঙে। অল্পক্ষণের ভেতরেই দেখলাম, ভারত-বিরোধী স্লোগান বন্ধ হয়ে গেছে। আরো অবাক হলাম এটা দেখে যে, মিটিংয়ে শেষ দিকে সেই জনতার মুখ থেকেই তিনি যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান বের করতে বাধ্য করলেন। মওলানার এহেন সম্মোহনী শক্তির প্রমাণ আরও পেয়েছি '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতেও।

তারপর আমাদের মিটিংয়ের স্থান নির্ধারিত হলো খুলনায়। আমরা সদলবলে রওয়ানা হলাম খুলনার উদ্দেশ্যে। খুলনায় আমরা আস্তানা গাড়লাম সেই কালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাপ নেতা আবদুল গফুর খানের বাড়িতে (খান আবদুস সবুর খানের ভাই)। পরদিন বিকেলে মিটিং। সকালে উঠেই আমি আর হাতেম ভাই বাড়ির সামনে পায়চারি করছি। মওলানা সাহেব ভেতর বাড়িতে স্থানীয় কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। একটু পরে দেখি দলে দলে লোকজন শিশি-বোতল হাতে আসছেন। জিগ্যেস করলাম, "আপনারা কি জন্য এসেছেন?" তাঁরা বললেন, "আমরা হুজুরের কাছে পানি পড়া নিতে এসেছি।" মওলানা সাহেবকে গিয়ে ওদের কথা বলতেই তিনি বললেন, "নিয়ে এসো বোতলগুলো।" আমরা সবার কাছ থেকে পানির বোতলগুলো সংগ্রহ করে ভেতরে নিয়ে গেলাম। মওলানা শুরু করলেন একে একে ফুঁ দেয়া। ফুঁ দেয়া হয়ে গেলে আমরা সেগুলো যার যার মালিকদের কাছে পৌঁছ দিতে লাগলাম। কিন্তু বোতল আসছে তো আসছেই। এর আর শেষ হয় না। এক সময় বিরক্ত হয়ে হাতেম ভাই বললেন, "আচ্ছা জসীম, আমরা ফুঁ দিয়ে দিয়ে দিলে হয় না? কঁহাতক আর ভেতর বাড়িতে শিশি আনা-নেয়া করা যায়?" বললাম, "বেশ হয়, আসুন তাই করা যাক।" এরপর থেকে আমরাই শিশিগুলো সংগ্রহ করে বাড়ির ভেতরে একটুখানি আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফুঁ দিয়ে আবার সেগুলো তাদের স্ব-স্ব মালিকের কাছে ফেরত দিতে লাগলাম। সেদিন বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত চললো এই কাণ্ড। মওলানা ভাসানীকে এতো দিন পীর সাহেব বলেই জানতাম, কিন্তু লোকের বিশ্বাস যে তাঁর ওপরে কতোটা গভীর, তার পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন।

'৬৭ সালের ঘটনা। ন্যাপ তখন ভাগ হয়ে গেছে দুই গ্রুপে। ভাসানী ন্যাপ আর রিকুইজিশন ন্যাপ। রিকুইজিশন ন্যাপের সভাপতি তখন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। আমরা রিজুইজিশন ন্যাপের শেল্টারে কাজ করছি তখন। এর মধ্যে একদিন খবর পেলাম মওলানা সাহেব ঈশ্বরদী প্লাটফরমে নেমেছেন। খুলনার দিকে যাবেন। পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভাসানী সাহেবের দল থেকে বেরিয়ে এলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা কিন্তু প্রতিটি কর্মীরই ছিলো। পড়ি কি মরি করে আমি আর মজিবর রহমান বিশ্বাস স্টেশনে ছুটলাম তার সাথে দেখা করার জন্য। দেখলাম সাঙ্গপাঙ্গসহ তিনি ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। ওয়েটিং রুমের ভেতরে গিয়ে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি যেনো জ্বলে উঠলেন। বললেন, "বেরো বেরো এখান থেকে! কেন এসেছিস তোরা আমার কাছে? রিকুইজিশনে ঢুকেছিস। তোদের নেতা তো এখন মোজাফফর। তার কাছে যা!" বললাম, "হুজুর অন্য গ্রুপে গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আপনি এসেছেন শুনে আর থাকতে পারলাম না। শত হলেও আপনিই তো আমাদের রাজনীতি শিখিয়েছেন।" বলেই দু'জন দু'পাশে বসে মওলানা সাহেবের পা টিপতে লেগে গেলাম। এবার দেখলাম, তার রাগ সম্পূর্ণ পানি হয়ে গেছে। ফজলি আম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাচ্ছিলেন এতোক্ষণ। দু'জনকে দুটো আম দিয়ে বললেন, "নে, আম খা। কিছু মনে করিস না। তোরা নেতা হয়েছিস শুনে বুকটা আমার ভরে গেছে।" আমরা বললাম, "আম পরে খাবো। আগে আপনার পা টিপে নিই।" বুড়ো এবার হেসে ফেলে বললেন, "তোরা তো বড্ড ফাজিল হয়েছিস" তারপর অনেক কথা বললেন আমাদের সাথে অনেক পুরনো কর্মীর খোঁজখবর নিলেন। মনে হলো, আপনজন বুঝি বহুদিন পর এসে আত্মীয় পরিজনের খোঁজ নিচ্ছেন। কর্মীদের সহজে আপন করে নেয়ার একটা ক্ষমতা সব সময়ই লক্ষ্য করেছি তাঁর মধ্যে। ফলে অনেক সময় তাঁর কটুবাক্যও কর্মীদের কাছে স্নেহমাখা শাসন বলেই মনে হতো।

'৬৬-৬৭ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির চীনপন্থী বিপ্লবীরা পার্টি ত্যাগ করলেন। আর তার কিছুদিন পর ন্যাপও ভাগ হয়ে গেলো। এই ভাগাভাগির হাওয়া আমাদের পাবনা জেলাতেও এসে লাগলো। পাবনার আলাউদ্দিন এই বিপ্লবী গ্রুপের একজন ছিলেন। পার্টির পাবনা জেলা শাখার মিটিং বসলো ঈশ্বরদীর অদূরে সাহাপুর গ্রামে। মিটিংয়ে উপস্থিত হলেন অতি বিপ্লবী আলাউদ্দিন, আবদুল মতিন আর হাসান মোল্লাসহ আরো অনেকে। আমাদের পক্ষের মজিবর রহমান বিশ্বাস (যিনি ভবঘুরে নামে অনেক বইপত্র লিখেছেন), অমূল্য লাহিড়ী, প্রসাদ রায়, আমি নিজে এবং আমাদের পক্ষের কর্মীরা। কেন্দ্র থেকে এলেন বারীন দত্ত (কমরেড আবদুস সালাম)। এই মিটিংয়ে চরম বাকবিতন্ডা চললো অনেকক্ষণ ধরে। অতি-বিপ্লবীরা বারীনদা ও অমূল্যদাকে যারপর নাই অপমান করলেন। প্রচন্ড বিতণ্ডার মুখে এক সময় মিটিং ভেঙে গেলো। আমরা চরম অপমানিত হয়ে সেদিন চলে এলাম সাহাপুর থেকে।

এর বেশ কিছুদিন পর ঈশ্বরদীতে আলাউদ্দিনের সাথে আমার দেখা। বললো, "জসীম ভাই, আমরা নতুন কমিটি করেছি শুনেছেন বোধ হয়? আপনাকে পার্টি থেকে এক্সপেন্ড করা হয়েছে। শুনে তো আমার পিত্তি জ্বলে উঠলো। বললাম, "আর কাকে কাকে করেছে?" বললো, আপনাদের সবাইকে। এই ধরুন মজিবর, আপনি অমূল্যদা এদেরকে।" বললাম, "তুমি এক্সপেন্ড করার কে শুনি?" দরকার হলে তোমরা অতিবিপ্লবীরা তোমাদের আদর্শ নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিপ্লব করো না কেনো? বিপ্লব তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে সারা হচ্ছে।" কথাগুলো বলেই হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। সারপথ একটা চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। সারা জীবন পার্টি করে এসে আজ কি না দু'দিনের বিপ্লবী আলাউদ্দীন বলে, আমাকে পার্টি থেকে এক্সপেন্ড করা হয়েছে! বাড়িতে এসে ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারলাম না। আমার ভাবসাব দেখে স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো, ' কি হয়েছে তোমার? মনমরা দেখছি?" তাকে বললাম সব কথা। শুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বললো, "এতে এতো ঘাবড়ানোর কি আছে? অমূল্যদা, প্রসাদ, এরা সবাই আছেন, তাদের সাথে দেখা করে শোনো, তাঁরা কি বলেন?"

আমার স্ত্রী মরিয়মকে দেখেছি, প্রথম থেকেই তিনি পার্টির কাজে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাতেন। আমাকে প্রায় সময়েই জেলে অথবা ফেরার অবস্থায় কাটাতে হতো, তবু সংসার নামের তরুণীর হালটি তিনি ঠিকই ধরে রাখতেন।

পরদিনই গেলাম লাহিড়ী মোহনপুরে অমূল্যদা'র বাড়িতে। সব কথা বললাম তাঁকে। শুনে অমূল্যদ বললেন, "ও এই কথা! তা তুমি এমন ভেঙে পড়েছো কেনো বলো তো দেখি! আরে আমরাই তো ওদের পার্টি থেকে বের করবো বলে ঠিক করেছি। আমরাও শিগগিরই মিটিং ডাকছি।"

এরপরই অমূল্যদা মিটিং ডাকলেন লাহিড়ী মোহনপুরে তাঁর বাড়িতেই। সে কী উৎসাহ তাঁর। পুকুর থেকে মাছ ধরলেন, কতো কী খাবারদাবার তৈরি করলেন। মিটিংয়ে উপস্থিত হলেন রণেশ মৈত্র, মজিবর রহমান, আমিনুল হক বাদশাসহ মস্কোপন্থী বলে পরিচিত সব কমরেডরা। অমূল্যদা'কে সম্পাদক করে আমরাও সে মিটিংয়ে তৈরি করলাম নতুন কমিটি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে টিকে আছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

কোথায় গেলো সেই অতি বিপ্লবী আলাউদ্দিন? নকশাল অর্থাৎ গলা কাটার রাজনীতি করলো কিছুদিন। এ সময় একবার তারা সাহাপুরে 'লালটুপি' সমাবেশ করলো। দেশ-বিদেশ থেকে কতো শত লালটুপি মাথায় লাল কমরেড এলেন সেই সমাবেশে। তারপর? এক পর্যায়ে মতবিরোধ দেখা দিলো তাদের সংগঠনে। কেউ দিলো নকশাল বাড়ির স্লোগান, কেউ দিলো সর্বহারার স্লোগান। তুমুল হৈ চৈ শুরু হল সমাবেশে। মওলানা ভাসানী 'খামোশ' 'খামোশ' করেও সেই হট্টগোল থামাতে ব্যর্থ হলেন। অতি বিপ্লবী নেতারা নিজ নিজ এলাকার সংগঠনভিত্তিক এক একটি উপদল সৃষ্টি করে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করতে গিয়ে আলাউদ্দিন সাহেবের শক্তিশালী সাহাপুর ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে গেলো। স্বাধীনতার পর পাগলের ভেক ধরে রইলো কিছুদিন। তারপর মওকা বুঝে টুপ করে ঝুলে পড়লেন এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টির গলায়। এরশাদ শাহিকে দাওয়াত করে এনে সাহাপুরে কৃষক সমাবেশ করলেন। শেষ বয়সে হাজী দানেশ এসে পচে গেলো আলাউদ্দীনের প্ররোচনায়। এরশাদ কৃষক সমাবেশে কৃষক না দেখে নাখোশ হলেন। সে অনেক কেচ্ছা। হালে আবার বি. এন. পি করা শুরু করেছেন এই বিপ্লবী নেতা!

তো হাজী দানেশের সেবার সেই সম্মেলনে এসে একেবারে বেহাল অবস্থা। সারাদিন খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি। বিকেলের দিকে দেখি আমার ঈশ্বরদীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় এসে হাজির। একেবারে নাস্তানাবুদ অবস্থায়। আমার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "মরিয়ম আমাকে ক'খানা রুটি বানিয়ে দাও শিগগির। সারাদিন খাওয়া হয়নি।" কেনো, প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিং করলেন, কতো ভালো ভালো খাবারই তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলো?" কথাটা সোজাসুজি বললাম। তিনি বললেন "আরে বলো না! এই আলাউদ্দিন আমাকে ডুবিয়ে ছাড়লো শেষ বয়সে।"

আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি করে খাওয়ার আয়োজন করলেন। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে তিনি পার্বতীপুরগামী ট্রেন ধরলেন বিকেলের দিকে।

চীনপন্থী ভাসানী ন্যাপের সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো এক এক এলাকায় এক এক নেতাকে। তারা নিজের নিজের এলাকায় জমিদারি ভাগের মতো করে গড়ে তুললেন এক একটি উপদল। এই তো বিপ্লবের ইতিহাস। সে সময় দেখেছি এই অতি বিপ্লবী নেতারা মওলানাকে যেনো হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেছে। মওলানা যেনো একটা মইক্রোফোন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের কাছে। সেই মাইক্রোফোনে যখন যা ইচ্ছে বক্তব্য প্রচার করা যেতো। এ-বেলা হয়তো মতিন এসে একটি বক্তব্য ধরিয়ে দিলো তাঁর হাতে। মওলানা মাইক্রোফোনের মতো তাই প্রচার করলেন। ও-বেলা তোয়াহা এসে বললেন, 'হুজুর আগে যেটা বলেছেন ওটা ভুল। এইটা বলুন।" মওলানা থুক্কু দিয়ে তাই প্রচার করলেন। শেষ জীবনে এসে, এইসব নেতার প্ররোচনায় জিয়ার পক্ষ নিয়ে ফারাক্কায় লং মার্চও করে এলেন তিনি। এভাবেই নিজের নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একজন অবিসংবাদিত জননেতাকে ব্যবহার করেছিলেন অতি বিপ্লবীরা।

১৯৬৮ সালে এসে আইয়ুব খান তাঁর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে উদযাপন করলেন উন্নয়ন দশক। বাঙালিদের সাথে কৌতুক করার জন্য এর চেয়ে ভালো বিষয় আর হয় না।

এ সময় আইয়ুব শাহি খতম, বি. ডি. সিস্টেম বাতিল ও সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে গণআন্দোলন শুরু হল তখন আমি ঈশ্বরদীতেই। ঈশ্বরদীতেও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) গঠন করা হলো। এই এলাকায় 'ডাক' গঠন করার মূলে কমিউনিস্ট পার্টির যথেষ্ট অবদান ছিলো। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, আলাউদ্দিন সাহেবরা এ -আন্দোলন থেকে যোজনদূরে থাকলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

'৭১-এর এপ্রিলের শেষ দিকে 'ডাক'-এর উদ্যোগে ঈশ্বরদী মোটর স্ট্যান্ডে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হলো। তখন এ এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। তবে বৃহৎ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতাদের অহমিকার কারণে মাঝে-মাঝেই আমাদের কর্মীদের সাথে তাদের বাকবিতন্ডা চলছে।

একদিনের ঘটনা বলি। ঈশ্বরদীতে তখন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। আমাদের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা ট্রেনিং নিতে আগ্রহী দেখে আমি ঈশ্বরদী পেণ্ড অফিসের নিরাপত্তা রক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করে সাতটি থ্রি-নট থ্রি রাইফেল সংগ্রহ করে দিলাম ওদের। ওদিকে তখন সারা মাড়োয়ারি হাইস্কুলে ছাত্রলীগ কর্মীদেরও ট্রেনিং চলছে। তো এই রাইফেল নিয়েই শুরু হলো ছাত্রলীগ কর্মী নেতাদের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের রেষারেষি। ছাত্রলীগ মনে করছে, প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে। অন্য কোনো সংগঠন এর মধ্যে নাক গলাক, তা ওদের পছন্দ নয়। ওরা কয়েকদিন হুমকি দিয়ে গেলো এই বলে, রাইফেলগুলো তাদের কাছে জমা দিতে হবে, নইলে অসুবিধা আছে। আমাদের ছেলেরা ওদের কথা কানেই তুললো না।

আমার বাসা তখন ঈশ্বরদী স্কুল পাড়ায়। একদিন দুপুরবেলা ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী কালাম ছুটতে ছুটতে এলো আমার বাড়িতে। আমার বড় মেয়ে বিলু চেঁচিয়ে ডাকলো, "খোকা! খোকা বইরে এসে দেখো কালাম ভাইকে কারা যেনো ধরতে আসছে।" ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি কালাম হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উঠলো উঠোনে। পেছন পেছন এলো আরও দু'জন ছেলে। হাতে তাদের রাইফেল। আমি ছেলে দুটোকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'ওকে তাড়া করছো কেনো? কি হয়েছে?" ওরা বললো, "ওদের কাছে যে রাইফেলগুলো আছে ওগুলো এখনি দিয়ে দিতে হবে। নইলে খুন করবো ওকে।" বললাম, "রাইফেলগুলো ওদের কাছে থাকলে ক্ষতিটা কোথায়? ওরাও তো যুদ্ধ করবে। দেশ স্বাধীন করার ঠিকেদারিতো তোমরা একা নাওনি? আমরাওতো এদেশের মানুষ। দেশ মুক্ত করার দায়িত্ব তো আমাদেরও আছে, নাকি বলো? ছেলেরা তবুও নাছোড়। বললো, "ওসব বুঝি না। রাইফেলগুলো আমাদের চাই-ই।" বললাম, "রাইফেল তোমাদের দেয়া হবে না। আর জোর করে যদি নিতেই চাও, তবে গোলাগুলি করেই নিতে হবে। যাও, এখন চলে যাও এখান থেকে।" ছেলেগুলো ফুঁসতে ফুঁসতে বিদেয় হলো।

যুদ্ধের প্রস্তুতিপূর্বে শুধু ঈশ্বরদীতেই নয় বাংলাদেশের সর্বত্রই এই বিরোধ লেগেছিলো আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৭১ এর মার্চের শেষে আওয়ামী লীগের আবদুল আজিজ (মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নকশালদের হাতে নিহত হন), ফকির নুরুল ইসলাম ও মহিউদ্দিন (প্রাক্তন সংসদ সদস্য) প্রমুখের সাথে মিলে পরামর্শ করা হলো, ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে যে চৌদ্দজন পাক সেনা রয়েছে, তাদের আত্মসমর্পণ করাতে হবে।

এই চৌদ্দজন পাক সেনার মধ্যে সাতজনই ছিলেন বাঙালি। তাদের কমান্ডে ছিলেন একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন। নাম সম্ভবত ক্যাপ্টেন আহসান। এই বাঙালি ক্যাপ্টেনের ইচ্ছানুযায়ীই আত্মসমর্পণ করানোর পরিকল্পনা করা হলো। তবে এই আত্মসমর্পণ হতে হবে জেনেভা চুক্তি মোতাবেক। বাঙালি সৈন্যরা যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চান, তবে যুদ্ধ করবেন। আর বাকি ছয়জন পাঞ্জাবি সেনাকে হত্যা না করে বন্দি করে রাখা হবে। এর ফলে আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল দুই-ই বাড়বে। পরামর্শ অনুযায়ী ১ এপ্রিল আত্মসমর্পণের দিন ধার্য করা হলো। এর মধ্যে ঈশ্বরদী ও তার আশপাশের এলাকায় ব্যাপক সাড়া জেগেছে, প্রতিরোধ আন্দোলনের।

সেদিনটির কথা আজও মনে আছে। গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এসেছে। বিমানবন্দরের সেনা শিবিরটি ঘিরে আছে তারা। ক্যাপ্টেন আহসান ও তার তেরোজন সৈন্য একে একে অস্ত্র সমর্পণ করলেন প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে। তাঁদের সবাইকে বন্দি করা হলো। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো পাকসেনাদের তারা বন্দি করতে পেরেছে বলে। পরবর্তী সময়ে ক্যাপ্টেন আহসান ও তাঁর অধীনস্ত সাতজন বাঙালি সৈন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন। কিন্তু ছয়জন পাঞ্জাবি সৈন্যকে কিছুতেই রক্ষা করা গেলো না। আমাদের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পদ্মার পাড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার পরামর্শ দিলো। আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কতো রাজনৈতিক হানাহানি, কতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কতো দলাদলি আর ষড়যন্ত্র দেখেছি, তার শেষ নেই। শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হতে দেখেছি অনেক। দেখেছি '৪৬-এর জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অন্ধ ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট তুলে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়ার ঘটনাও কম দেখিনি। কলের পুতুলের মত সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোকে শাসকের ঘৃণ্য চক্রান্তে মরণ নাচও নাচতে দেখেছি কতো।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। যা সংঘটিত হলো সবই ওই স্বার্থান্ধ শ্রেণীর স্বার্থে। যারা একদিন তাদের জঘন্য শোষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির দোহাই দিয়ে '৪৬-এর দাঙ্গা বাধিয়েছিলো, এবারও তাদের মুখে একই জিগির শুনলাম, "কাফের মারো, কাফের ধ্বংস করো। পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষ কাফের হয়ে গেছে। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের পাক ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।"

২৫ মার্চ রাতে তাই অকস্মাৎ নেমে এলো পাক পশুরা রাজধানী ঢাকার রাজপথে। বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা নিয়ে।

তার ঠিক ষোলোদিন পর পাকসেনারা নগরবাড়ি ঘাট থেকে রাস্তার দু'ধারের বাড়িঘর জ্বালাতে জ্বালাতে এসে উপস্থিত হলো ঈশ্বরদীতে। আমি তখন ঈশ্বরদী কন্ট্রোল রুমে (ঈশ্বরদীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে কন্ট্রোল রুম গঠন করা হয়েছিলো প্রতিরোধ আন্দোলনের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য)। আমার সাথে আছেন ভবঘুরে মজিবর এবং বেশ কিছু আওয়ামী লীগ নেতা। টেলিফোনে খবর এলো পাবনা থেকে, "এখন আর ঈশ্বরদী থাকা নিরাপদ নয়। আপনারা যতো তাড়াতাড়ি পারেন পালিয়ে যান। পাকবাহিনী নগরবাড়ি থেকে পাবনার দিকে রওয়ানা হয়েছে।"

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম বাসায়। দেখি এর মধ্যেই সমস্ত ঈশ্বরদী শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে লোক লটবহর নিয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারে। নগরবাড়ীর দিক থেকে মুহুর্মুহু মর্টার আর মেশিনগানের টা-টা-টা-টা আওয়াজ ভেসে আসছে। মর্টারের শেলগুলো যেন কানের কাছে দিয়ে শিস কেটে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাবনা রোডের দু'পাশ থেকে ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি উঠতে দেখলাম। সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছে রাস্তায়। নারী-পুরুষ-শিশুর আর্তচিৎকারে বাতাস ভারি হয়ে গেছে। সবাই ছুটছে ঈশ্বরদীর পশ্চিমের গ্রাম মাজদিয়া আর আড়মবাড়িয়ার দিকে।

বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'শিগগির বেরিয়ে পড়ো। পাকসেনারা ঈশ্বরদী এসে গেছে। এক্ষুনি পালাতে হবে। বাড়িতে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিলো না তখন। মেয়েরা তার বড় বোনের ওখানে চলে গিয়েছিলো আগেই। বাড়িঘরের সব কিছু পড়ে রইলো অমনি। শুধু পরনের কাপড় সম্বল করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে সারা মাড়োয়ারী স্কুলের পেছনের মাঠে চলে এলাম। মাঠে লোক থইথই করছে। দক্ষিণে পিয়ারপুল পর্যন্ত বিশাল মাঠে লোক যেনো ধরছে না। সবাই ছুটছে মাজদিয়া গ্রামের দিকে। আমরা সেদিকেই ছুটতে লাগলাম। মাজদিয়ার এসে আমার পরিচিত এক মোড়লের ওখানে উঠলাম। আমার স্ত্রী আগে থেকেই অসুস্থ ছিলো। তারপর দীর্ঘপথ ছুটে এসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মোড়ল বললো, "মণ্ডল সাহেব, এখানেই থেকে যান। গ্রামে বিহারিরা আসবে না। ওরা গ্রামের মানুষকে ভয় করে।" বললাম, "শুধু বিহারিরাতো আসবে না মোড়ল সাহেব, সঙ্গে মিলিটারি আসবে। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আপনারাও যত শিগগির পারেন সরে পড়ুন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই মোড়লের ওখান থেকে বেরিয়ে সারাঘাটে এলাম। আমার কাছে তখনো একটি রিভলবার রয়েছে। কোমরে গামছা দিয়ে ভালো করে বেঁধে নিলাম সেটা। রাস্তায় বেরিয়েছি যখন আপদবিপদে কাজে লাগাতে পারে যন্ত্রটা। সারাঘাটে এরি মধ্যে শয়ে শয়ে লোক এসে উপস্থিত। হরদম খেয়া নৌকো আসছে যাচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ নৌকার পর নৌকোয় চেপে নদীর ওপারে চলে যাচ্ছে। আমার পরিচিত একটি ছেলেকে পেলাম ঘাটে। সে-ই আমাদের নৌকো ঠিক করে দিলো। ওপারে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা লেগে গেলো। হাজার হাজার লোক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় হাঁটতে না পেরে পেছনে পড়ে গেলেন। কিছুতেই অন্ধকার তাকে আর খুঁজে পেলাম না। শেষমেষ দামুকদিয়া এসে আমার পরিচিত এক রাজনৈতিক কর্মীর বাড়িতে উঠলাম। সে রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী কোথায় গিয়ে উঠলো, কিছু হলো কি না তার, সে চিন্তায় চোখে ঘুম এলো না সারারাত। পরদিন সকালে গিয়ে আমার সেই পরিচিত কর্মীটি খোঁজ নিয়ে এলো, আমার স্ত্রী পাশেই এক বাড়িতে এসে উঠেছে। আমার খোঁজ পাওয়ার পর আমার স্ত্রী তখন তখুনি চলে এলো এ-বাড়িতে। দামুকদিয়া এসে একটু সুস্থির হতেই পরিচিত দুজন ছেলেকে বললাম, "তোমরা তো সারাঘাটে যাচ্ছো। আমার বাড়িটা একটু দেখে আসতে পারবে?" ওরা বললো, 'পারবো না কেনো?" বললাম, "যদি অবস্থা ভালো দেখো, তবে ঘরে চাল-আটা আছে, সঙ্গে নিয়ে এসো।"

ওরা চলে গেলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। তবু ছেলে দুটো ফেরে না। ওদের মা-বাবাও অস্থির হয়ে উঠলেন। না জানি কী হলো! আমি কেবলি ঘর বার করতে লাগলাম। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতো লাগলো বারবার। যদি ওদের কিছু হয়, তবে ওদের মা-বাবার কাছে কি জবাব দেব আমি?

অবশেষে রাতে ফিরে এলো ছেলে দু'জন। সাথে করে নিয়ে এসেছে একটিন আটা আর চাল। ওরা বললো, "আমরা যখন মাজদিয়া এসে পৌঁছুলাম, তখনি বিহারিরা আপনার বাড়িতে আগুন দিলো। আমরা নিজের চোখে দেখে এলাম, আপনার বাড়ি পুড়ছে।" শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। আমার স্ত্রীতো কেঁদে উঠলো একেবারে ডুকরে। রাজনীতি করতে গিয়ে কিছুই করতে পারিনি, সম্বল ছিলো ওই দশ কাঠা জমি আর দুটো চালাঘর। সেটুকুও হারিয়ে গেলো। এখন তো আমি পুরো ঠিকানাবিহীন। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে চোখের পানি মুছেটুছে আমার স্ত্রী এবার আমাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন, "বাড়ি গেছে আবার হবে। দেশ স্বাধীন হলে দেখো বাড়িঘর সব হবে। তুমি অতো ভেঙে পড়ছো কেনো?" এই হচ্ছেন আমার স্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দামুকদিয়াতেও আর থাকা সম্ভব হলো না। ১২ এপ্রিল হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হলো। মাথার ওপর যেনো কেয়ামত ভেঙে পড়লো। দামুকদিয়ার লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ি ছেলে পালাতে শুরু করলো। আর আমরাও বর্ডারের দিকে ছুটতে লাগলাম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। হাজারে হাজার লোক ছুটছে তো ছুটছেই পোটলা পুটলি, গরু বাছুর সব সঙ্গে নিয়ে। চারদিকে শুধু কোলাহল, কান্নাকাটি। আর পেছন থেকে এক মহাআতঙ্ক তাড়া করে আসছে। সবার গতি তাই সামনের দিকে। মৃত্যু যেনো মুখব্যাদান করে আসছে হাজারো মানুষকে গ্রাস করতে। শেষ পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে এস উঠলাম কালীদাশপুরে মামাবাড়ি। এসে দেখলাম মিরপুর চৌধুরী বাড়ির বউ-ঝিরা সেখানে আগে থেকেই এসে উঠেছে। এককালের জমিদার চৌধুরীদের বউ-ঝিদের দেখলাম, পাকিস্তানপ্রীতি তাদের এখনো আছে।

যা হোক মামাবাড়িতে থাকবো না, ইন্ডিয়া চলে যাবো একথা শুনে মামা একখানা গরু গাড়ি ভাড়া করে দিলেন। এদিকে আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছি। পেট গোলানো বমি বমি ভাব। শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে উঠছে। উপরন্তু আমার স্ত্রীও অসুস্থ। তাই গরুগাড়ির ব্যবস্থা করতেই হলো।

আমরা দু'জন মানে আমি আর আমার স্ত্রী চলেছি। আমাদের বাহন লজঝড় সেই গরুগাড়ি। যেতে যেতে একসময় ক্ষিদে পেলো প্রচণ্ড। কিন্তু খাবার পাই কোথায়? সবাই তো বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কী ভেবে গাড়ি থেকে নেমে এক গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাড়িতে কোনো লোকজন নেই। ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। এদিকে ক্ষিদেয় আর শরীর চলছে না। স্ত্রীকে বললাম, "আর ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করলে চলছে না। আমি ওই রান্নাঘরে ঢুকে দেখি কিছু খাবার পাই কি না।" গ্রামের গৃহস্থের রান্নাঘরে সাধারণত দরজা থাকে না। শুধু ঝাঁপের মত দরমার কোয়াড় দেয়া। কোয়াড় ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকলাম। না, ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন। হাঁড়ির মধ্যে পেয়ে গেলাম বেশ কিছু পরিমাণ ভাত। এখনো গরম। বোধ হয় খেয়ে যাওয়ারও অবসর পায় নি বাড়ির লোকজন। শিকের ওপর রাখা হাঁড়িতে রান্না করা মাংসও আছে। আমি হাঁড়ি পেড়ে নিয়ে বেশ খানিকটা মাংস ভাতের হাঁড়িতে তুলে নিলাম। তারপর ছোট্ট একটা মাটির কলসিতে পানি ভরে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে। বাড়ির বাইরে এসে গরুগাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির মধ্যেই ভাত-মাংস খেতে খেতে রওনা হলাম বর্ডারের দিকে।

কতো লোকের সাথে দেখা হচ্ছে পথে। কতো রকমের জিনিসপত্তর কাঁধে মাথায় করে ছুটছে তারা। দেখলাম, বাবলা গাছের ছায়ায় এক বুড়ি বসে আছে। কোলে কয়েকটা মুরগি আর হাতে একটি ছাগলের দড়ি ধরা। শেষ সম্বল যা ছিলো, তাই নিয়েই পথে নেমেছে। অথচ এখন এতোগুলো প্রাণী সঙ্গে নিয়ে পথ চলাই দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছে। বললাম, "বুড়িমা, ঐ ছাগল মুরগির মায়া ত্যাগ করে গাড়িতে উঠে এসো বুড়ি কিছুতেই গাড়িতে উঠতে রাজি হলো না। কারণ জীবন যায় যাক, তবু সে তার ছাগল মুরগির মায়া ত্যাগ করতে পারবে না।

আমাদের গরুগাড়ি চলছে তো চলছেই। এ চলার যেনো শেষ নেই। আল্লাহর দরগার কাছে যে পাকা সড়ক, সেই সড়ক পার হয়েই আমাদের বর্ডারে যেতে হবে। শুনলাম, কিছুক্ষণ আগে সেই সড়ক দিয়ে কয়েক ট্রাক মিলিটারি গেছে কুষ্টিয়ার দিকে। অথচ এই পাকা সড়ক ধরে কিছুদূর গিয়ে তবেই অন্য রাস্তায় নামতে হবে। অনেকেই বললো, "এই রাস্তা দিয়ে এখন গরুগাড়ি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।" তবু মরণপণ করে উঠলাম পাকা রাস্তায়। জান হাতে নিয়ে এই রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে ও-পাশের রাস্তায় নেমে গেলাম। এতোক্ষণ পরে ধড়ে যেনো জান ফিরে এলো।

রাস্তার ও-পাশের গ্রামের ভেতরে ঢুকতেই দেখি প্রতিরোধ বাহিনী ব্যারিকেড করে আছে। শত শত লোক ঢাল সড়কি, লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তা আগলে বসে আছে। আমাদের গাড়ি দেখে হৈ হৈ করে সবাই ছুটে এলো। গাড়ি থেকে জোর করে নামালো তারা আমাদের। জিগ্যেস করলো, কোথায় যাচ্ছি, কি সমাচার? বললাম, "ঈশ্বরদী থেকে আসছি। বর্ডারে যাবো।" উত্তর শুনে ওরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলো না। আমার চেহারাসুরত দেখে অনেকে আমাকে বিহারি বলে সন্দেহ করলো। কিছুতেই আর যেতে দেবে না। ওদের দলের লিডারগোছের একজন বললো, "আপনার পরিচিত কেউ এখানে আছে যে আপনাকে দেখলেই চিনতে পারবে?" বললাম, "এখানে আর পরিচিত লোক পাবো কোথায়। তবে একজন আছেন, নাম লুৎফর রহমান। কলেজে পড়ান। তিনি আমাকে চিনবেন। এক সময় এক সঙ্গে পার্টি করতাম আমরা।

এখান থেকে কিছু দূরেই লুৎফরের বাড়ি। তাকে ডাকতে গেলো একজন। লুৎফর বাড়ি ছিলেন না। তাঁর ভাই এলেন ছুটতে ছুটতে। আমাকে দেখেই বললেন, "আরে জসীম ভাই, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললাম, "বর্ডারে যাচ্ছি। ওপারে যাবো।" আমাকে আর কোনোরকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঈশ্বরদীর খোজখবর নিতে লাগলেন তিনি। বাড়ির সবাই কে কোথায় আছে জানতে চাইলেন। তারপর বেরিকেডঅলাদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কাকে ধরে রেখেছো জানো? এঁর নাম জসীম মণ্ডল। বিরাট নেতা। শ্রমিক নেতা। নাম শোনো নি?" ওদের মধ্যে অনেকেই আমাকে নামে চিনতো। তারা লজ্জায় মাথা নত করলো। লুৎফরের ভাই বললেন, "জসীম ভাই আমাদের বাড়ি চলুন। নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া হয়নি। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে তারপর যাবেন।" বললাম, "আমরা দু'জনই অসুস্থ। যতো তাড়াতাড়ি কোলকাতা পৌছুতে পারবো, ততোই মঙ্গল। এখন আর কোথাও উঠবো না। সোজা বর্ডারে যাওয়ার চেষ্টা করবো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরোধঅলারা তবু ছাড়লো না। পাশেই একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রুটি মাংস খাইয়ে তবে বিদেয় করলো।

এক জায়গায় এসে রাস্তায় বেশ কজন লোকের সাথে দেখা হলো। মাথায় মাথায় তাদের খাবারের গামলা। জিগ্যেস করলাম, "কোথায় যাচ্ছো তোমরা?" ওরা বললো, "কুষ্টিয়ায় প্রতিরোধ বাহিনীর লোকদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে পাঞ্জাবিদের সাথে যুদ্ধ করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে তারা।"

শ্যামপাড়ার কাছে এসে আমাদের গাড়ির গরু হাঁপিয়ে উঠলো। আর কিছুতেই গাড়ি টানতে চায় না। দুটোর মধ্যে একটা গরুতো শুয়েই পড়লো। কিছুতেই আর ওঠে না। মাঠের মধ্যে কাজ করছিলো একজন লোক, ব্যাপারটা দেখে সে এগিয়ে এলো। দেখলাম লোকটা আমার চেনাই। শ্যামপুরের আবুল। আমার মামার শ্বশুরকুলের লোক। সে বাড়ি থেকে এক জোড়া বলদ এনে আমার গাড়িতে জুতো দিল। গাড়োয়ানকে বললো, 'তোমার গরু আমার বাড়িতেই রইলো। আসার পথে বদলে নিও।"

শুরু হলো আমাদের যাত্রা। আড়িয়া ইউসুফপুর গ্রামে এসে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামলাম একটা বটতলায়। দেখলাম বহু নারী পুরুষ শিশু যাওয়ার পথে বিশ্রাম নিচ্ছে গাছের নিচে শুয়ে বসে। গ্রামের বউ ঝিরা রুটি, তরকারি পানি ইত্যাদি এনে খাওয়াচ্ছে তাদের আপনজনের মতোই। আমার দেখে খুব ভালো লাগলো। এই যুদ্ধ মানুষে মানুষে হানাহানি এনেছে যেমন তেমনি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি আর আত্মিক বন্ধনেরও সৃষ্টি করেছে। দেখলাম অদূরের বটগাছের আশপাশেও বহু পরিবার বসে আছে। ওখানেই একটি হিন্দু পরিবারের দুটি যুবতী মেয়েকে দেখলাম মুখ ঢেকে অঝোর ধারায় কাঁদতে। জিগ্যেস করে জানলাম এখানকারই দুটো ছেলে আসার পথে জোর করে পাটের খেতে নিয়ে গিয়ে ওদের সম্ভ্রম লুটেছে। শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। প্রতিরোধ বাহিনীর দুজন বন্দুকঅলা ছেলেকে দেখলাম, লোকজনের তদারিকতে তারা ব্যস্ত। ওদের ডেকে জানালাম ঘটনাটা। তখন তখুনি ছেলে দুটোকে খুঁজে বের করলো বন্দুকঅলারা। খালের ধারে বসে বসে ছিলো ব্যাটারা। বললাম, "দেশের বিপদের সময় অসহায় নারীদের ওপর যারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, তারা এদেশের শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দাও, তবে এমন কাণ্ড আরো ঘটবে।" বন্দুকঅলা দুজন ছেলেও দেখলাম ওদের কঠিন শাস্তি দিতেই আগ্রহী। ছেলে দুজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে ওদের পা লক্ষ্য করে গুলি চালালো। চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দিলো মা বোনের ইজ্জত হরণকারী দুই পশুকে। পরে শুনেছিলাম, যুদ্ধের ন'মাস জুড়ে ওই রাস্তাটিই ছিলো শরণার্থীদের পারাপারের সবচাইতে নিরাপদ জায়গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে বহু ঘটনা পেছনে ফেলে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর পৌঁছুলাম গিয়ে গোড়লী বর্ডারের ফিঙ্গিতলায়। সেখান থেকে করিমপুর হয়ে কৃষ্ণনগর। তারপর কোলকাতায়।

কোলকাতা পৌঁছেই পরিচিতদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর কথা মনে হলো, তিনি ইলাদি। নাচোল সাঁওতাল বিদ্রোহের রানী ইলা মিত্র তখন কোলকাতায় বসবাস করছেন। খুঁজে খুঁজে তাঁর ওখানেই গিয়ে উঠলাম। রমেনদা আর ইলাদির আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন পর দেখা, তবু মনে হলো সেই আগের ইলাদি রমেনদাই রয়ে গেছেন। এতোটুকু পরিবর্তন নেই তাঁদের আন্তরিকতায়। ইলাদি সবার খোঁজ খবর নিলেন। বললাম, ইলাদি বিপদে পড়েই আপনাদের বিরক্ত করতে আসতে হলো। আমরা দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কোলকাতা অচেনা জায়গা। কোথায় উঠি- এইরকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে আপনাদের কথাই মনে পড়লো। রমেনদা বললেন, "তবু যা হোক মনে পড়েছে তোমাদের। সেই কবে দেশ ছেড়ে এসেছি। দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা বড় বেশি করে প্রাণে বাজে। তোমাদের দেখে তবু সেই ব্যথার কিছুটা উপশম হলো।"

এরপর রমেনদাই অনেক চেষ্টা চরিত্র করে আমাদের দু'জনকেই কোলকাতা পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এলে রমেনদাই পার্টির পত্রিকা 'রণান্তর'-এর সম্পাদকের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার মেয়েরাও এসে পড়েছিলো এরি মধ্যে। সেই বাসায় আমরা ছাড়াও, লতিফ ও তাঁর স্ত্রী সুনন্দা লতিফ থাকতেন। এরপর পার্ক সার্কাসের পার্টি অফিসে বড় ভাই অর্থাৎ মণি সিংহের সাথে দেখা হলো। সেখানে সৈয়দ আলতাফ হোসেন, অমুল্যদা আর রণেশ মৈত্র– একে একে সবার সাথেই দেখা হয়ে গেলো।

এই সময় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা) সেক্রেটারি ইন্দ্রজিত গুপ্ত আমাদের বিভিন্ন মিটিংয়ে নিয়ে যেতেন। এভাবেই শত ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কেটে গেলো ভারতে ন' মাসের প্রবাসী জীবন।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম, তখন আমার মাথার ওপর এতোটুকু আচ্ছাদনও নেই। নেই পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করবার মতো এতোটুকু ঠাঁই। তবু আশায় বুক বেঁধে রইলাম, স্বাধীন দেশে আমার ঘর হবে। নতুন করে জীবন শুরু হবে একটি সাজানো বাড়িতে। সে আশা আমার আশাই রয়ে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিহারিদের একটি পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা বাড়িতে জুটলো অবশেষে আমার আশ্রয়। এখনো সেখানেই আছি।

১৯৭৩ সালের দিকে মস্কোর ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে আমার একবার মস্কো সফরের সুযোগ হয়েছিলো। আমার সফরসঙ্গী ছিলেন আরও দু'জন, ইঞ্জিনিয়ার মূর্তজা খান আর আদমজী এলাকার এক শ্রমিক লীগ নেতা। তার নামটা এখন আর মনে করতে পারছি না। তো সেই সফরের খুটিনাটি বিবরণ এখানে পেশ করতে চাই না। আমি শুধু সেখানকার কিছু মজাদার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেবো।

ভারতের বম্বে এয়ারপোর্ট থেকে 'এয়ারোফ্লুত' বিমানে চেপে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। জীবনের প্রথম প্লেনে চড়েছি, মনের মধ্যে তাই একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। মেঘগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে জানালার পাশ ঘেঁষে। চৈত্র মাসে ঠিক যেমন করে শিমুল তুলো উড়ে যেতে দেখেছি গাছ থেকে, তেমনিভাবেই ওরা উড়ে উড়ে যাচ্ছিলো। যেনো হাত বাড়ালেই মুঠো মুঠো ধরা যাবে। সে কী মনোরম দৃশ্য, সে দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বম্বে থেকে প্লেনে উঠে প্রথম যেখানে নামলাম, সে জায়গাটার নাম 'তিবলিশ'। জর্জিয়ার রাজধানী। বম্বে থেকে প্লেনে যখন চড়েছিলাম, তখন বেশ গরম। আর তিবলিশ এয়ারপোর্টে এসে যখন প্লেনের দরজায় পা রাখলাম, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যেনো কষে চড় বসালো আমার দু'গালে। এতো শীত এখানে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তিবলিশ এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমাদের যাত্রা শুরু হলো মস্কোর উদ্দেশে। এতোক্ষণ তো আকাশে মেঘ দেখছিলাম, এবার ভয়ে ভয়ে তাকালাম নিচের দিকে। আমাদের রাবণের রথ তখন চলেছে ভলগা নদীর ওপর দিয়ে। নদীর মধ্যে জাহাজগুলো ভেসে যাচ্ছে, তেলেপোকা যেমন পানিতে ভাসিয়ে দিলে ভেসে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে।

মস্কোতে এসে যখন প্লেন থেকে নামলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর ক্লান্তিতে তখন আমার শরীরের দফারফা হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য টেউ ইউনিয়ন কর্মকর্তারা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন মস্কোর অভিজাত হোটেল 'স্পুটনিক'-এ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে দিয়ে বিদেয় হলেন তাঁরা। সাথে রইলেন শুধু আমাদের দোভাষী। দোভাষী ভদ্রলোক একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, তবে ভাষা ইন্সটিটিউট থেকে বাংলা শিখে দিব্যি দোভাষীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের হাত-মুখ ধোয়ার পর তিনি নিয়ে গেলেন খাবার টেবিলে। সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের অন্যান্য নেতা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। আমরা উপস্থিত হলে একসঙ্গেই খেতে বসলেন সবাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবার টেবিলে বসে তো আমার দু'চোখ ছানাবড়া। নানান রকম খাবার দেয়া হয়েছে। সবই সেদ্ধ। সেদ্ধ মাংস, সেদ্ধ সবজি– এইসব। নুন-ঝালের বালাই নেই তাতে। আমার মুখে রুচল না এসব খাবার। টেবিল থেকে রুটি তুলে মাখন আর চিনি মিশিয়ে খেতে লাগলাম। কমরেডরা অবাক হয়ে দেখছেন আমার খাওয়া। টেবিলে একটি প্লেটে দেখলাম নানান ধরনের পাতাপুতি। মস্কোর কমরেডরা দেখি তৃপ্তির সঙ্গে তাই চিবিয়ে খাচ্ছেন। কৌতুহলবশত প্লেট টেনে নিলাম। দেখি ধনের পাতা, পেঁয়াজের পাতা, রসুনের পাতা।

এসব আবার মানুষ খায় নাকি?

আমার কমরেড দোভাষী বললেন, 'ওগুলো খেয়ে দেখো, খুবই টেস্টি। বললাম, 'ওগুলো তো আমাদের দেশে ছাগল খায়।" শুনে তো দোভাষী হো হো করে হেসে উঠলেন। অন্যান্য কমরেড হাসির কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি বলছেন উনি?"

দোভাষী বুঝিয়ে বললেন, "ওদের দেশে নাকি ছাগলে খায় ওগুলো।" শুনে তো সবার মধ্যে এবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

রাতে শোয়ার জন্য দেয়া হলো ইয়া মোটা গদিঅলা খাট। ফোমের গদি, চাপ দিলেই ফুটখানেক দেবে যায়। খাটে উঠে যখন গা এলিয়ে দিলাম, মনে হলো, আমি যেনো চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। দু'পাশ থেকে গদি উঁচু হয়ে এমনভাবে আমাকে ঠেসে ধরতে লাগলো, যেনো দম আটকেই মারা যাই আর কি! এদিকে আমার দোভাষী তখন রাতের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদেয় হয়েছেন। কাউকে ডাকাও যায় না। তাছাড়া অভিজাত হোটেল। রাতে কাউকে ডিস্টার্ব করা বারণ। কী করি এখন? কিছুতেই তো ঘুম আসে না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে এক বুদ্ধি বের করলাম। মেঝের কার্পেটে ঘুমুলে কেমন হয়? কার্পেটটাও তো বেশ নরম। ঘুমুলে দেখছে কে? বালিশ আর কম্বল নামিয়ে কার্পেটের ওপরই শুয়ে পড়লাম। বেশ ঘুম হলো রাতে। তারপর থেকে ওভাবেই শুতে লাগলাম।

একদিন সকালের কথা। ঘুম থেকে উঠেছি, কিন্তু কার্পেটের ওপর থেকে বালিশ তোলার কথা মনে নেই। কিন্তু সেদিন সকাল সকাল দোভাষী এসে উপস্থিত। দরজা খুলে দিতেই মেঝেতে তিনি বালিশ দেখে বললেন, "কমরেড, তুমি বিছানায় ঘুমোওনি?। বললাম, 'খাটে একটু ডিফেক্ট ছিলো, তাই ঘুমুতে অসুবিধা হচ্ছিলো। 'ডিফেক্ট?" হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন দোভাষী হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে গদি তুলে খাট পরীক্ষা করতে লেগে গেলো, কিন্তু কোনো ডিফেক্টই ধরা পড়লো না।

এবার দোভাষীকে ডেকে চুপি চুপি বললাম, "কমরেড বলতেও লজ্জা করে। আমার নরম বিছানায় শোবার অভ্যাস নেই, তাই এই ব্যবস্থা।" শুনে দোভাষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, "কমরেড আমিও তোমার দলে। আমিও নরম বিছানায় ঘুমুতে পারি না।"

কয়েকদিন পর বেড়াতে বেরিয়েছি মস্কো শহরে। সাথে আছেন কমরেডরা। মস্কো শহরে মেট্রো রেল চালু আছে। তো সেই রেলে উঠবো বলে আমাদের জন্য টিকিট কিনতে গেলেন দোভাষী। বললাম, "কমরেড আমার আমার টিকিটটি কিন্তু নিও না। আমি বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে দেখতে চাই তোমাদের কম্পিউটার আমাকে ধরতে পারে কিনা।"

মেট্রো রেলে কোনো টিকিট চেকার নেই। দরজায় কমিপউটার বসানো আছে। কম্পিউটারই ধরে দিচ্ছে, কার কাছে টিকিট আছে বা নেই। টিকিট না থাকলে গাড়ির পাদানিতে পা রাখার সাথে সাথে দরজা আবছে আপ বন্ধ হয়ে যায়। দোভাষী বললেন, 'তুমি পারবে না, কমরেড, কিছুতেই পারবে না।"

বললাম, "দেখিই না চেষ্টা করে।"

ট্রেন এলা হনহনিয়ে। যাত্রীরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে একে একে উঠে যাচ্ছে ট্রেনে। আমি আমার সঙ্গীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এগুতে লাগলাম। এতো লোক ঢুকলো অথচ একবারও দরজা বন্ধ হলো না। হয়তো কম্পিউটার কাজ করছে না। দরজার কাছে এসে আমার আগের কমরেড জাফিয়ে ট্রেনে উঠে গেলেন। আমিও টুক করে পাদানিতে সবে পা রেখেছি, অমনি ঘটাং করে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। পেছনের যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠলেন। আজব জিনিস দেখছে তারা। বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার পাওয়া গেছে এতদিনে। আমাদের সঙ্গীরা যাত্রীদেরকে বুঝিয়ে বললেন, উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তো? টেস্ট করে দেখছিলেন টিকিট ছাড়া ট্রেনে চড়া যায় কিনা।" আমার দোভাষী বললেন, "কমরেড, হঠাৎ করে এমন টেস্ট করার শখ তোমার জাগলো কেনো বলতো দেখি?"

বললাম, "আমার দেশে এসব মেট্রো ফেট্রো নেই তো, তাই বিনা টিকিটেও মাঝে মাঝে গাড়িতে চড়া যায় আর কি!" আর একদিনের ঘটনা। রাতে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কার্পেটে শুয়েও না। মনে হচ্ছে কানের কাছে যেনো পুপু করে মশার ডাক শুনছি। চোখ বুজলেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি মশা কামড়ে দিলো। পরদিন সকালে দোভাষী এলে বললাম, "কমরেড, একটা মশারি ম্যানেজ করে দেয়া যায়? মশার কামড়ে রাতে ঘুমুতে পারছি না।" শুনে তো দোভাষী একেবারে হাঁ, "মশা? এই হোটেলে? বল কি কমরেড? পুরো মস্কো শহর ঘুরলেও তো তুমি মশা পাবে না। আর মশারি? ওটা তো এখানকার লোক চেনেই না। আচ্ছা তুমি যখন বলছো তখন হোটেল কর্তৃপক্ষকে বলে ঘরটাতে ওষুধ স্প্রে করার ব্যবস্থা করছি।" তো সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই হোটেলের লোক এসে ওষুধ ছিটিয়ে দিয়ে গেলো। সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর, বাথরুম কোথাও বাদ রাখলো না। সে রাতে ঘুঘুতে গিয়েও আবার একই উপদ্রব। কানের কাছে সেই মশার পুপু।

পরদিন দোভাষীকে বলতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা কমরেড, তোমার দেশে কি মশা আছে?" বললাম, "আছে মানে? বাঙালি কবির কবিতাই তো আছে মশা নিয়ে– 'রাতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কোলকাতায় আছি'। শুধু কোলকাতায় কেন? ঢাকায়ও মশা কম যায় না।"

শুনে দোভাষী বললেন, "এই জন্যই তুমি মস্কোতে এসেও মশার ডাক শুনছো কমরেড।"

'৭৩-এ আমি যখন মস্কোতে যাই মানুষের মধ্যে যে অপরিসীম গতিময়তা দেখেছি, সমাজতন্ত্রের প্রতি যে অবিচল আস্থা লক্ষ্য করেছি সেটা মেকি বলে মনে হয়নি। তা হলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েত সমাজের এই অবক্ষয় কি করে হলো, আমি ভাবতেও পারি না। আমার তো মনে হয়, সোভিয়েত জনগণের বর্তমানে সেই কবিতায় উচ্চারিত কথার মতোই অবস্থা হয়েছে, "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ও পারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।' হয়তো খোলা হাওয়ার প্রতি তাদের আস্থা হারাতে বেশি দিন লাগবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কিছু কথা

বৃটিশ আমলে আমরা যারা শ্রমিক শ্রেণী থেকে পার্টিতে এসেছিলাম, তারা পার্টির আদর্শ উদ্দেশ্য অতোশতো বুঝতাম না। শ্রমিক সংগঠন 'লাল ঝাণ্ডা' শ্রমিকের কথা বলে, তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করে কেবল এটুকুই ছিলো তখন আমাদের জানা বোঝা। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ– এসব তখন বুঝতামও না বা বোঝার চেষ্টাও করতাম না। তখন আমাদের কাছে নেতারাই ছিলেন আদর্শ এবং তাঁদের আচার আচরণ, কর্তব্য নিষ্ঠা এগুলোই ছিলো আমাদের পার্টিতে আসার অনুপ্রেরণার উৎস। তখনকার দিনে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের কী পরিমাণ ত্যাগ তিতিক্ষা আর সাধারণ শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের কী পরিমাণ ভালোবাসা ছিলো, তা বলে শেষ করা যাবে না। আবার কর্মীরা নেতার প্রতি এতখানি অনুরক্ত ছিলো যে, নেতার একটি নির্দেশে তারা জান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারতো।

কতগুলো ছোট ঘটনার উল্লেখ করলেই আমাদের প্রতি নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পৃথিকৃৎ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের কথাই বলি। তিনি ছোটোবড়ো কোনো কর্মীকেই তুমি বলতে পারতেন না। সবার সাথেই 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলতেন। এটা তাঁর অভ্যাসই ছিলো বলতে গেলে। আমাদের সবার 'কাকাবাবু' ছিলেন তিনি। কোলকাতায় ছোট্ট একটি বাসায় থাকতেন। যেখানে যা কিছু পেতেন, সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন নিজের ডেরায়। কারও বাড়িতে হয়তো বাড়তি মশারি দেখলেন, বাচ্চাদের জামা জুতো অথবা পশমি কম্বল দেখলেন, বললেন, 'আপনারতো অনেকগুলো দেখছি, এর থেকে একটা আমাকে দিন না।" কমরেড মুজফফর সাহেব একটা জিনিস চাইছেন, না দিলে কেমন হয়! সবাই উৎসাহভরেই দিয়ে দিতেন। আর তারতো ওঠা বসাও ছিলো জাঁদরেল জাঁদরেল সব লোকের সাথে। যা হোক, এসব জিনিসপত্রের সংগ্রহ করে তিনি পোটলা বেঁধে রাখতেন।

আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন আমাদের সবার "কাকাবাবু"। কাকাবাবু কিন্তু মফস্বল থেকে কোনো কর্মী দেখা করতে গেলে পার্টির কিংবা সংগঠনের কোনো কথাবার্তা কিংবা কাজ হচ্ছে না কেনো, সংগঠন বাড়ছে না কেনো, এসব কৈফিয়ত চাইতেন না (এখনকার নেতারা যেমন কর্মী মরলো কি বাঁচলো সে খোঁজ না নিয়ে সংগঠনের কাজ কতোদূর এগুলো সেই খবর আগে নেন)। অথচ তিনি আগে বাড়ির ছেলেমেয়ে কেমন আছে, তদের জামাকাপড় আছে কিনা, সে সব খোঁজ নিতেন। কারো গায়ে একটু ছেঁড়া জামাকাপড় দেখলেই বলতেন, "আপনার জামাটি তো দেখছি ছিঁড়ে গেছে? ঐ পুটলিটা পেড়ে আনুনতো দেখি, একটা জামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায় কিনা!" তারপর খুঁজে খুঁজে মাপমতো একটা জামা বের করে দিয়ে বলতেন, "এটা পরুনতো দেখি।" অনেককেই এই সময় মুজাফ্ফর সাহবের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের জামা জুতার মাপও নিয়ে যেতে দেখেছি। আমি মাঝে মাঝেই যেতাম তাঁর কাছে। বলতেন, 'জসীম ভাই কেমন আছেন?"

বাবা মারা গেছেন, সংসার কীভাবে চলছে, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে, নানান খোঁজখবর নিয়ে তারপর সংগঠনের কথা পড়তেন। নানান উপদেশ দিতেন। আর তাঁর সেসব কুশল প্রশ্নে থাকতো এক অপরিসীম আন্তরিকতার ছোঁয়া।

সেই বিজনদা, বিজন সেন, খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের গুলিতে যিনি চির বিদায় নিলেন, কতদিন জেল থেকে আমার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, "মরিয়ম, ছেলেমেয়ে নিয়ে মার বাড়িতে এসে ওঠো। বাড়িতো আমার পড়েই আছে।" আমার স্ত্রীকে তখন আমার শ্বশুররা যেতে দেননি। কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে উঠবে ছেলেমেয়ে নিয়ে, না দরকার নেই। রাজশাহীতে বর্তমান কল্পনা সিনেমা হলের সামনে রাস্তার ধারে তার দোতলা বাড়িটা এখনো আছে। সামনে পুকুর আর বাগানঘেরা বাড়ি। আমাকে কতোদিন নিয়ে গেছেন সে বাড়িতে। বিজন সেনের বোনরা বলতেন, "কাকে নিয়ে এলে দাদা, মুসলমান নয়তো?"

বিজনদা বলতেন, 'আরে না, কি যে বলিস তোরা? মুসলমান হতে যাবে কেনো? ও হিন্দু, খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে।"

ঠাকুর ঘরের সামনে দিয়ে দোতলায় উঠতে হতো। আমি যেতে চাইতাম না দেখে বিজনদা আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতেন ওপর তলায়। বলতেন, "জসীম তোমার তো পাঞ্জাবি দরকার, তাই না? মটকা কাপড় আছে, নবাবগঞ্জের দামি মটকা। তোমাকে মানাবে ভালো। আজই দুটো পাঞ্জাবি বানিয়ে নাও।" আলমারি খুলে কাপড় বের করে দিতেন। বলতাম, "দাদা, আপনাদের কি কাপড়ের দোকান আছে নাকি?" উত্তরে বলতেন, "আরে দোকান থাকতে যাবে কেনো? দাদারা কিনে এনে রেখেছে, দুটো পিস মেরে দিলাম। তুমি ধরো তো? তোমার এতো হিসেবের দরকার কি?"

একদিন তিনি তার ছোট বোনদের সামনে আমাকে 'জসীম' বলে ডেকে উঠতেই সে কী কেলেঙ্কারি! বোনরা ধরে বসলেন, 'দাদা ওতো মুসলমান। ওকে ভেতরে নিয়ে এসেছো? ঠাকুমা দেখলে কেলেঙ্কারি ঘটাবে।" বিজনদা বললেন, "আরে না, ওতো হিন্দু। খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে। তবে একটু গরুটরু খায়, এই যা। তবে ঠাকুমাকে যেনো বলিস না, কেমন?"

ইলাদি, তাঁর সব জমিজমাই তো আজাহার ভোগদখল করতো। আমরা বলতাম, ইলাদি জমিজমাতো সব আজাহার দখল করে নিলো, আপনারা খাবেন কি? ইলাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে বলতেন, "দখল করেছে কে বলেছে তোমাদের? আরে আমিই তো দিয়ে দিয়েছি ওদের।"

জেলখানায় আলাপ হয়েছিলো ত্যাগী কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জির সাথে। জেলের মধ্যে তখন বিড়ি অত্যন্ত দুষ্পাপ্য জিনিস। সন্তোষদা নিজে কখনো ধুমপান করতেন না, অথচ নিজের পয়সা খরচ করে প্যাকেট প্যাকেট বিড়ি কিনে রাখতেন রাজবন্দিদের জন্য। বিড়ি বিলিয়েই যেনো আনন্দ পেতেন তিনি। এই রকম যাঁদের আচার ব্যবহার, সাধারণ শ্রমিকদের তাঁরা আকৃষ্ট করবেন না তো, কে করবেন?

যশোরের সাইফুদ্দাহারের কথা বলি। ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেতেন বলে অনেকেই তাঁকে ডাকতেন 'পাগলা কমরেড' বলে। অসম্ভব চিন্তাভাবনা করতেন পার্টি পলিটিক্স নিয়ে। শ্রমিকনেতা ফয়জুদ্দাহারের ভাই। আমরা তাঁকে 'বড়দা' বলে ডাকতাম। কোনো ব্যাপারে যদি তাঁর মতামত চেয়ে বলতাম বড়দা এইটা করতে চাচ্ছি।" বলতেন, "কর"। আবার যদি বলতাম, "এই কাজটি হতেই হবে, আপনি কি বলেন?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, "হোক"। বলতাম, "বড়দা, আমরা যাই বলি আপনি শুধু হাঁ বলে যান, কখনো না বলেন না। আপনার কি নিজস্ব কোনো মতামত নেই?"

বলতেন, "তোমাদের মতই তো আমার মত। পার্টিতে তোমাতে আর আমাতে কি তফাৎ আছে কোনো?"

ধূমপানের অভ্যাস তাঁর ছিলো না কোনোদিনও। আমাদের জেলের ভেতরে সে সময় একজন ম্যানেজার নির্বাচন করেছিলাম, যাঁর দায়িত্বে বিড়ি থাকতো। তিনি প্রতিদিন তিনটি করে বিড়ি দিতেন প্রত্যেককে। তো একদিন বড়দাকে বললাম, "বড়দা আপনি তো বিড়ি খান না। আপনি যদি তিনটি করে বিড়ি নিয়ে আমাদের দিয়ে দেন, তবে ভালো হয়।" বড়দা তাঁর স্বভাবসুলভ হাঁ দিয়ে জবাব দিলেন, "তোমরা যখন চাইছো, এখন থেকে নেবো।"

অমুল্য লাহিড়ী, আমাদের অমূল্যদাকে দেখেছি জমি বিক্রি করে পার্টির কর্মীদের খুটিনাটি চাহিদা পূরণ করতে। আমার তখন চাকরি গেছে। ত্রিশ টাকা মাসোহারায় পার্টির হোল টাইমারি করছি। মাসোহারা ত্রিশটি টাকা হাতে হয়তো পেয়ে পাবনা চলেছি। বাসের মধ্যে অমূল্যদার সাথে দেখা। তিনি সংসারের কুশলাদি জানার পর জিগ্যেস করলেন, "পাবনা চললে কি জন্য?" বললাম, "দাদা মরিয়মের কাপড় ছিঁড়ে গেছে সেই কবে, তাই টাকাটা পেয়ে ভাবলাম, কিনে আনি একখান।" বললেন, "কাপড় নেই! তা আগে বলবে তো? আরে দুই বিঘে জমা বেচেছি? দুই বিঘে! আর কি কি নেই বলো। ঝটপট বলে ফেলো কাপড়? জামা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটিকোট? তেল? তেলও তো নিতে হবে এক বোতল। মাথার ফিতে, ক্লিপ, এগুলো কিনবে না? চলো, সব কেনা হবে। দুই বিঘা জমি বেচেছি।"

মনে হলো জমি বিক্রির টাকা কাউকে দান করতে পারলে যেনো অমূল্যদা শান্তি পাচ্ছিলেন না। পাবনা গিয়ে এক জোড়া শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ সব জোড়া জোড়া, সেই সাথে তেল, সাবান, ফিতে, ক্লিপ কিনেটিনে বিরাট এক বোঁচকা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে।

এই উদার হৃদয়ের মানুষটির কথা কি কোনোদিন ভুলতে পারবো? তখন যে স্নেহশীল হৃদয়বান মানুষগুলো আমাদের সামনের কাতারে ছিলেন, তাঁরাই তো আমাদের আদর্শ। তাই পার্টিতে এসেও কোনোদিন আর আদর্শ খুঁজতে যাই নি।

বর্তমান পার্টি তো কর্মীদের মধ্যে সে ত্যাগ কই? কই সর্বস্ব দিয়ে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ? তখন পার্টির পত্রিকা খুললেই দেখা যেতো, অমুক কমরেড পার্টি ফান্ডে এতো টাকা দান করেছেন। অমুক কমরেড দিয়েছেন বউয়ের গা-র গহনা।

আর আজ? পার্টির লাল কার্ড পেলেই কমরেড বসে থাকেন বাড়িতে। পার্টি গোল্লায় যাক, নিজের স্বার্থটি আগে গোটানো চাই। এদের দেখে আগামী প্রজন্ম কি শিখবে? পার্টির প্রতি আনুগত্যের লেশমাত্র নেই এসব কমরেডের মধ্যে। তাইতো রাশিয়ার সাম্প্রতিক খোলা হাওয়া সহজেই তাদের বিশ্বাসের দুর্গ ভেঙে ঢুকে পড়ে। মার্কসবাদ-সেকেলে হয়ে পড়ে তাদের কাছে। লেনিন হয়ে যান ব্যর্থ নেতা। কিন্তু আমরা পোড়-খাওয়া কমরেডরা, আজও মনে করি মার্কসবাদ অব্যর্থ। যতোদিন না সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন কেনো তত্ত্ব এসে উপস্থিত হচ্ছে, ততোদিন মার্কসবাদের পতন নেই।

তো এবার, আজকের দিনের সৌখিন কমরেডদের একটা ঘটনা বলি। এই তো সেদিন, একানব্বুইয়ের নভেম্বর মাসের দিকে মোবারকগঞ্জে রেলশ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন শেষ করার পর যশোরের কালীগঞ্জে কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে ডাক পড়লো। কয়েকজন নব্য কমরেড নিতে এসেছে আমাকে। ছয় সাতখানা হোন্ডা মোটর সাইকেলে চেপে। পার্টির পতাকা উড়িয়ে এক একটায় দুজন করে কর্মী বসেছে সেই মোটর সাইকেলে। তাদের কী সংগ্রামী সাজ পোশাক। মাথায় লাল ফিতে বাঁধা। হাতেও লাল ফিতে। সুটেড বুটেড সব কমরেড। কোনোদিন হয়তো গ্রামের খানাখন্দে তাদের পাও পড়েনি। অভিজ্ঞতাও হয় নি। আজ মিটিংয়ের সুযোগ হোণ্ডায় চড়ে গ্রামে চলেছে শহুরে সব কমরেড। বললাম, "গাঁয়ের মধ্যে মিটিং করতে যাচ্ছো তো সব হোণ্ডায় লাল পতাকা বেঁধে। গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে তো? হোণ্ডা চলবে তো সেখানে? বুঝে দেখো!" তাদের যে নেতা, তার আবার গলার সাথে ঝুলছে হুইসেল। বললাম, 'এটা আবার নিয়েছ কেনো?" সে বলল, "বুঝলেন না? আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতারা যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় যে রকম হুইসেল বাজাতে বাজাতে যায় আমরাও তেমনি করে যাবো। এটুকুন না করলে তো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না।" বললাম, "ও! আচ্ছা। তবে চলো।"

নেতা আমাকে মোটর সাইকেলে তুলে নিলো। বললাম, "একটু আস্তে চালিও বাপু! আমার আবার এসবে ওঠার তেমন অভ্যাস নেই।" সে বললো, "কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আপনি শুধু শক্ত হয়ে বসে থাকুন।" তাদের কথামতো শক্ত হয়েই বসে রইলাম। আমাদের লিডার ফি ফি করে বাঁশি বাজিয়ে খানাখন্দের ভেতর দিয়ে এমন করে সাইকেল চালালো যে কয়েকবার পড়তে পড়তে তো মাটিতে পা নামিয়ে তবে বাচা। বললাম, "রাস্তার অবস্থা তো দেখছো, আস্তে চালাও বাপু। আমার বুড়ো হাড়ে ওসব সইবে না।" লিডারের সেই একই কথা, "শক্ত করে ধরে থাকুন। কোনো অসুবিধে নেই। গ্রামের রাস্তা, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে।" বললাম, "নামো না কেনো, ভাঙা পার হয়ে ওঠা যাবে।" সে কিছুতেই রাজি হলো না। ভাঙাচোরার সাথে যুদ্ধ করেই গাড়ি চালিয়ে গেলো। ফলে আমার কোমরেরও কাহিল অবস্থা। মেজাজটা ভীষণ খিচড়ে গেলো। এরাই হচ্ছে কমরেড! যারা কি না মানুষের ব্যথা বেদনাও বোঝে না!

চলতে চলতে এবার রাস্তায় একটা খাল। বন্যার সময় রাস্তা ভেঙে এদিক দিয়ে পানি বেরিয়ে গেছে। দু'পাশের রাস্তা ঢালু হয়ে খালে মিশেছে। ছলছলে পানি আছে। তবে কাদা তেমন নেই। লিডারকে বললাম, "এবার নেমে পড়া যাক। খাল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠবো।" সে বললো, "নামতে যাবো কেনো? আপনি বসে থাকুন। দেখুন না কি করি।" বললাম, "পানির মধ্যে নেমে তোমার সাইকেল না চললে, তখন কিন্তু আমি নামতে পারবো না।" সে বললো, হান্ড্রেড টেন হোন্ডা পানির মধ্য দিয়ে ঠিকমতো চলে যাবে। আপনি শুধু পা টা একটু উঁচু করে বসে থাকুন। তাই করলাম। লিডার সাহেব বীর বিক্রমে হোন্ডা নামিয়ে দিলো খালে। দু'পাশে পানি ছিটকে ছিটকে পড়লে লাগলো। প্রায় পার হয়ে এসেছি খাল। এ সময় ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে থেমে গেলো হোণ্ডা! লিডার বললো, "যা! থেমে গেলো।" আমি বললাম, "থামুক আর যাই করুক, আমি কিন্তু মানছি না।" শেষমেষ লিডারকে তার স্যুট-কোট আর দামি জুতোর মায়া। ত্যাগ করে নামতেই হলো পানিতে। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলাম হোন্ডার ওপরে। আর সব কমরেড দৌড়ে এসে লিডারের হোন্ডা টেনে তুললো। ভাবলাম, এরপর আর বেশি বাড়াবাড়ি করবে না। বেশ শিক্ষা হয়েছে ব্যাটার। কিন্তু কিছুই না। এরপর এলো নড়েবড়ে একটা বাঁশের মাচা দেয়া সাঁকো। এর ওপর দিয়েই পার হতে হবে আমাদের। সাঁকোর বাঁশের খুঁটিগুলো লোক উঠলেই হেলছে-দুলছে। আমি বললাম, "এবার আর মোটর সাইকেল নয়, হেঁটেই পার হবো।" লিডার আর তার সঙ্গীরা হোণ্ডা চালিয়েই পার হয়ে গেলো। বুঝলাম, বিপ্লব হবে এদের দিয়েই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পুলের ওপর পা রাখতেই যেনো দুনিয়াটাই দুলে উঠলো। ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে। পাশেই রাস্তার ধারে ছোট্ট চায়ের একটা দোকান। দোকানী এতোক্ষণ ধরে দেখছিলো আমাদের এতোসব কাণ্ডকারখানা। এবার ডেকে বললো, "সাহেব ভয় পাচ্ছেন কেনো? ওই পুলের ওপর দিয়ে রাজার হাতি পার হয়ে গেলো, আর আপনি তো সামান্য প্রজা।" সে হেসে বললো, "রাজার হাতি চিনলেন না? আরে এম. পি. সাহেবের জিপের কথা বলছি। সেদিনই তো এম.পি সাহেব জিপ নিয়ে পার হলেন এই সাঁকো। ঐ একই কথা হলো। আগে রাজাদের থাকতো হাতি আর এখন থাকে জিপ গাড়ি।"

অনেক কষ্ট করে সেদিন শেষ পর্যন্ত মিটিংয়ে পৌঁছেছিলাম। এই ঘটনার ভেতর দিয়ে একটা বড়ো ধরনের অভিজ্ঞতাও হয়েছিলো আমাদের আজকের কমরেডদের চালচলন সম্পর্কে। মাঝে মাঝে অনেক কমরেডের ড্রইং রুমেও আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। সেখানে ঢুকেই দেখি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে মার্কস-লেলিনের ছবি (অবশ্য এখন আর শখের কমরেডররা লেনিনের ছবি ঝোলাতে চাচ্ছেন না)। ড্রইং রুমের শো-কেসে শোভা পায় মার্কস-এর ক্যাপিটাল আর লেনিনের বইপত্র। কমরেডরদের কাছে এটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভাবি, "এদেশে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি? আমাদের এতো দিনকার শ্রম কি তা'হলে বৃথা যাবে?"

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা বাংলাদেশের কমরেডদের হতাশাগ্রস্ত করুক আর না করুক, আমার স্ত্রীকে কিন্তু যথেষ্ট হতাশ করেছে। স্ত্রী মরিয়মকে আমার জেলজীবনে আশায় বুক বেঁধে সংসার আগলে থাকতে দেখেছি। সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করতে করতেই এ পর্যন্ত টেনে-হেঁচড়ে এসেছে। পার্টির জন্য বাপের সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করে সাহায্য করেছে, এমন কি নিজের গায়ের গহনা পর্যন্ত পার্টির তহবিলে দান করেছে। আমার ছন্নছাড়া জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়ার কারণে বাবা-মা'র কাছ থেকে নানান কটু কথাও শুনেছে বিস্তর। তবু তাকে কোনোদিন আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে দেখিনি। বরং আমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো যুগিয়েছে উৎসাহ।

জেলে থাকার সময় বাড়ি বাড়ি কাজ করে সংসার চালিয়েছে, তবুও তার মুখ থেকে কোনোদিন কোনো রকম অভিযোগ বা অনুশোচনার কথা শুনিনি কখনো। এমনকি দীর্ঘদিন জেলে থাকার কারণে আমার শ্বশুর আবার তাকে বিয়ে দিতে চাইলে সে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকৃতি জানাতেও দ্বিধা করেনি।

সেই যে সেই ঘটনাতো আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘ পাঁচ বছর রাজশাহী জেলে ফাটক খেটেছি তখন। এর মধ্যে স্ত্রী কিংবা ছেলেমেয়ের সাথে দেখা একদিনের জন্যে হয়নি। তখন আমার মেয়ে মনা, পান্না আর ছেলে বাবু মাত্র সাত আট বছরের। আমার শ্বশুর আমার স্ত্রী ও ছেলেমেদের নিয়ে একদিন জেল গেটে এসে হাজির হলেন।

তখন রাজশাহী জেলের বিশ নম্বর সেলে বিনয়দা, মনসুর হাবিব, চট্টগ্রামের পাঁচকড়ি ও আমি একসঙ্গে থাকছি। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমার স্ত্রী আমার সাথে দেখা করতে এসেছে শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হলাম জেল গেটে। আমার স্ত্রীকে দেখলাম কেমন একটা সংকোচমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ছেলেমেয়েরা এগিয়ে এলো। কেমন যেনো অচেনা অচেনা লাগছে সবাইকে। যে মেয়েদের এতোটুকু দেখে এসেছিলাম, আজ তারা অনেক বড় হয়েছে। ছেলেটিকে দেখে এসেছিলাম এক পা দু'পা করে হাঁটতে, আজ সে সাত-আট বছর বয়সের। আমার শ্বশুরকে দেখলাম কেমন যেনো রেগে অস্থির। বললেন, "তুমি যে বিয়ে করেছো, ঘর সংসার আছে, সেটা কি তোমার মনে আছে?" বললাম, "মনে থাকবে না কেনো?" রেগে বললেন, "এই কি সেই মনে থাকার নমুনা? রাজনীতি করে জেলে ঢুকে দিব্যি আরামে খাচ্ছোদাচ্ছো। ওদিকে ছেলেমেয়ে-বউ কি খাচ্ছে, কি করছে, একবার তোমার খেয়াল নেই?" বললাম, "জেল থেকে ছাড়া না পেলে খেয়াল করবো কি করে বলুন?"

আমার এই জবাব শুনে শ্বশুর মশাই তেলে বেগুনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন। সোজাসুজি এবার বললেন, "দেখো, বাবাজি, তুমি যদি বন্ড না দিয়ে এভাবে জেলে বসে থাকো আর রাজনীতি করো, তবে আমার মেয়ে আর তোমার ঘর করবে না। মেয়েকে আমি আবার বিয়ে দেবো-তোমাকে সাত দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে বন্ড লিখে দেবে। আমি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি, নয়তো তাকে বিয়ে দিয়ে দেবো। তুমি বন্ড দেবে কি না আমি আজ এ কথাই জানতে এসেছি। নয়তো তোমাকে দেখতে আসতে আমার শখ লাগে নি বড়ো।"

শ্বশুরের কটুবাক্য শুনে আমি অসহায়ের মতো স্ত্রীর দিকে তাকালাম। দেখি সে তার বাবার পেছনে গিয়ে হাত ইশারায় আমাকে বন্ড দিতে নিষেধ করেছে। দেখে আনন্দে আমার মন ভরে উঠলো। সত্যি বলতে কি, স্ত্রী গর্বে সেদিন আমার বুক এতোখানি ফুলে উঠেছিলো। স্ত্রীর হাত ইশারাতেই আমি তার মতামত জেনে ফেললাম। শ্বশুর মশাইকে বললাম, "আপনি যা-ই বলুন, বন্ড আমি দিতে পারবো না।" রেগে আগুন হয়ে শ্বশুর মশাই জেল গেট থেকে বিদেয় হলেন। এমন কি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে দিলেন না।

কমরেডরা আগে থেকেই জানতেন, আমার স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরের সাথে আমার মনোমালিন্য চলছে। এমন কি শ্বশুরের 'বন্ড' দেয়ার চাপাচাপির কথাও তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতেন। সেলে ফিরে দেখি তাঁরা উৎকণ্ঠিতভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বিনয়দা বললেন, "কি জসীম, কি কথা হলো শ্বশুরের সাথে?" পাঁচকড়ি ছিলেন একটু রসিক ধরনের। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "কি আর হবে?" জসীমদা বউকে তালাক দিয়ে এলেন বোধ হয়?" বললাম, "আমার শ্বশুর মশাই বন্ড দিতে বলছেন, নইলে মেয়ের অন্য কোথাও বিয়ে দেবেন বলে হুমকি দিয়ে গেলেন।" মনুসর হাবিব এতোক্ষণ শুনছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার বউ কিছু বলেনি?" বললাম, "আমার স্ত্রী কিন্তু বন্ড দিতে নিষেধ করলো।" একথা শুনে পাঁচকড়ি উল্লাসে সেল ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বউদি কি জয়।"

তাই ভাবি জীবনের সুদীর্ঘ সময় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে আমিই বা কি পেলাম আর আমাকে চির জীবন উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে আমার স্ত্রীর ভাগ্যেই-বা কি জুটলো? একজন মেয়ের জীবনে সবচাইতে বড় আকাঙ্খা একখানা সাজানো সংসার। আর সেই সংসার গড়ার সুবর্ণ সময়টিতেই তাকে ছন্নছাড়ার মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হলো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্ত্রীর তিল তিল করে গড়ে তোলা চালাঘর দুটোও বিহারিরা পুড়িয়ে দিয়েছিলো জসীম মণ্ডলের রাজনীতি করার অপরাধে। সেই দশ কাঁঠা জমিও বিক্রি করে সংসার চালাতে হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আজ সারা বাংলাদেশে আমার এতোটুকু জায়গা নেই, যে জমিটুকু আমি নিজের বলে দাবি করতে পারি। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বর্তমানে বসবাস করছি। তাও বৈধ মালিক আমি নই। সারা জীবনের এই তো আমার পাওয়া। জীবনভর যে আদর্শের জন্য লড়াই করে এলাম, তারও যদি বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারতাম, তবু এই মন সান্ত্বনা পেতো। সেখানেও কোনো আশা দেখি না।

এই আদর্শের জন্য আমার একমাত্র ছেলে বাবুও আজ আমার কাছে পরিত্যাজ্য। লোকে জানে, জসীম মণ্ডলের কোনো ছেলে নেই। কিন্তু ছেলে আমার ছিলো। অসম্ভব মেধাবী একজন ছেলের বাবা ছিলাম আমি একদিন। তার কথা একটু বলতে ইচ্ছে করে। আমার ছেলে বাবু প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে। বোধ হয় '৬৯-এর দিকেই। পাবনা পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট ভর্তি করিয়ে দিলাম তাকে। ওখানে গিয়েই তার যতোকিছু মতিভ্রম ঘটলো। আমার বাড়ির পাশের একটি মেয়ের সাথে তার কেমন করে জানি সম্পর্ক হয়। এ সময়ই পড়াশোনার ইতি টেনে পালিয়ে গিয়ে নাম লেখায় এয়ারফোর্সে। চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের কোহাটে চাকরি নিয়ে। সেখানে সে গোল্ড স্মাগলিং-এ জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আর সবার মত সেও পালিয়ে আসে বাংলাদেশে। আমি তখন কোলকাতায়। দেশে ফিরে কাউকে না জানিয়ে তার সম্পর্কের সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে ভারতে চলে আসে সে। আমি তখন তার কোনো খোঁজ খবরই জানি না। এর মধ্যেই একদিন কোলকাতায় ন্যাপ নেতা হালিম চৌধুরীর কাছে শুনলাম, পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে সে। ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দি আছে, আর তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী হালিম চৌধুরীর ওখানে। খবর পেয়ে আমি আর অমূল্যদা জ্যোতি বসুকে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ছাড়িয়ে আনলাম তাকে। ইলাদির ওখানেই এনে রাখলাম। ইলাদি রমেনদা অনেক বোঝালেন কোলকাতায় থেকে যাবার জন্য। কিন্তু ওখানে না থেকে একদিন বউ নিয়ে আবার বাংলাদেশে চলে গেলো সে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার জয়েন করলো এয়ার ফোর্সের চাকরিতে। কিন্তু চরিত্রের পরিবর্তন হলো না কোনোরকম। আবার জড়িয়ে পড়লো চোরাচালানে। ফলে তার সাথে আমার আর কোনোরকম সম্পর্ক রইলো না। আমার ছেলের এই অধঃপতন আমি মেনে নিতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম, জিয়াউর রহমানের সময় সংঘটিত ক্যু'র সাথে জড়িত থাকার অপরাধে চাকরি গেছে তার। তারপর আমিও তার খোঁজখবর নিইনি। নেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। প্রবৃত্তিও হয়নি। বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি সে। আমার সবচাইতে হাসিখুশি চঞ্চল মেয়েটি, নাম আলো, তার বিয়ে দিয়েছিলাম একটা ভালোঘর দেখে। কিন্তু ক'মাস পরেই ছেলেটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর থেকে আমার কাছেই আছে। সব সময় মনমরা হয়ে থাকে। ছেলেকে ত্যাজ্য করার কারণে আমার স্ত্রী'র হয়তো একটা গোপন অভিমান রয়েছে আমার ওপরে, তবে সেটা সে প্রকাশ করে না কখনো।

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জীবনের পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখি, পাওয়ার পাল্লাটি শূণ্য। বঞ্চনার পাল্লাটি ভারি হয়ে আছে বেশি। তবুও হতাশ হতে মন চায় না। এ যেনো এক কঠিন নেশা, সুতীব্র আকর্ষণ, যা উপেক্ষা করে থাকা কখনো সম্ভব নয়। তাইতো অনাচার-অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বয়সেও ছুটি মিছিলে, ঝাঁপিয়ে পড়ি আন্দোলনে। বক্তৃতার ঝড় তুলি সভামঞ্চে। আর যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, যতোদিন অচল-অক্ষম না হয়ে পড়ি, ততোদিন অক্ষুণ্ন থাকবে আমার জীবনের এই ধারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু শয্যায়

গুরুতর আহত মজুররা সবাই ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে। রাত্রে এক এক জনার জ্ঞান ফিরে আসছে। তাদের সবাই প্রথমে প্রশ্ন করছে মৃণাল চক্রবর্তী কেমন আছেন? ডাক্তার, নার্স, ছাত্র– যাকে সামনে দেখছে তাকেই ঐ এক প্রশ্ন। তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। এমন রোগী তো তারা দেখেনি। কাতরানি নেই, বাঁচবে কিনা সে জিজ্ঞাসা নেই, আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে প্রশ্ন নেই, সবার মুখে একটাই কথা : মৃণাল চক্রবর্তী কেমন আছেন? এরা এক অদ্ভুত মানুষ। এই একটা ঘটনায় মজুররা হাসপাতালের সবার মন জয় করে নিল। আহত মজুরদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁরা অসাধারণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ডাক্তাররা আশ্বাস দিলেন, ফার্ষ্ট এইড খুবই ভাল হয়েছে, সবাই বেঁচে যেতে পারে; এ রকম প্রাথমিক চিকিৎসা না হলে কমপক্ষে এক ডজন মারা যেতো। কোন কোন ডাক্তার ফার্ষ্ট এইড দিয়েছেন তা জানতে চাইলেন তাঁরা। তাঁদের যখন বলা হলো যে, একা অঞ্জলি চৌধুরীই এদের সবার প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন তখন তাঁরা তা বিশ্বাসই করেন না।

মজুরদের প্রশ্নের ফলে মৃণালের উপর ডাক্তারদের বিশেষ নজর পড়ল। তাঁরাই প্রস্তাব করলেন, মৃণাল বাবুর আঘাত গুরুতর হলেও তাঁর গায়ে গুলির আঘাত নেই। ভয়ের কিছু নেই, শুধু কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। আপনারা তাঁকে অন্য কোথাও রাখুন, সেখানে আমরা চিকিৎসা করব। পুলিশের খোঁজখবর দেখে মনে হচ্ছে এখানে থাকলে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন।

ঢাকেশ্বরী মিলের একজন ডিরেক্টার এসেছিলেন আহত মজুরদের জন্য প্রচুর ফল ও হরলিক্স নিয়ে। তাঁকে দেখে আহত মজুরদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন কোন মিলের মালিকদের যেন আহতদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেয়া না হয় এবং তাঁদের নিকট হতে যেন কোন খাবার গ্রহণ না করা হয়। কিন্তু রোগীরা সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোন কথা বিশ্বাস করছে না। তারা কোন পথ্য গ্রহণ করছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি মালিকদের দেয়া কিছু খাইয়ে দেয়। ইউনিয়নের কথা ছাড়া তারা কিছু খাবে না। তাদের আরও বক্তব্য এই যে, আত্মীয় স্বজন যেই যা কিছু দিক তা ইউনিয়নের নিকট দিতে হবে, ইউনিয়ন তা প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। এই ব্যবস্থাগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হলো। ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় দু'একজন কর্মীর দিবারাত্রি হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

একদিন বিকেলে হাসপাতালে গিয়েছি। গিয়ে শুনি সেদিন একটা গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। নরেশের অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন।

জ্ঞান ফিরে আসার পরে প্রথম দিনই আহত মজুররা সবাইকে বলাবলি করে একটা নিয়ম ঠিক করে নেয় যে, যতই যন্ত্রণা ও কষ্ট হোক মুখ বুঝে তা সয়ে যেতে হবে, তারা কেউ কাঁদবে না, কোন কাতর চিৎকার করবে না। চিৎকার কি কান্নাতে তো আর যন্ত্রণা কম লাগবে না, অথচ মালিকদের কানে সে কথা গেলে তারা খুব মজা দেখবে।

যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। অস্ফুট কোন কাতর শব্দও কেউ কোন মজুরের মুখে শোনেনি। তারা এমন ভাব দেখাত যেন তাদের তেমন কিছুই হয়নি। কিন্তু এই মজুরদের সাথে গুলিতে আহত হয়েছিল মিলের বাজারের এক ছোট দোকানদার। তার হাঁটু ভেদ করে রাইফেলের গুলি চলে যায়। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করত। মজুররা তাকে বারবার নিষেধ করেছে, তাকে অনেক বুঝিয়েছে যে, এতে মজুরদের দুর্নাম হয়। আজ সকালেও নরেশ তাকে ডেকে অনেক বুঝিয়েছে, চিৎকার না করার জন্য অনেক অনুরোধ করেছে। কিন্তু বেচারা সেই দোকানদারের চিৎকারের বিরাম নেই। নরেশ উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ দাঁড়াতে যায়, দোকানদারের চিৎকার সে থামাবেই। কিন্তু সে দাঁড়াতে পারবে কেন। তার একটা পায়ের গোড়ালিতে হাড়ের কোন অস্তিত্বই নেই, রাইফেলের গুলিতে তা বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এক্সরে ফটো দেখলে মনে হয়, পায়ের কতকটা জায়গা যেন একেবারে ফাঁকা। তাই দাঁড়াতে গিয়ে নরেশ পড়ে যায়।

পনের ষোল বছরের কিশোর এই নরেশ। তারা বাবা ১নং ঢাকেশ্বরী মিলের মজুর। বৃদ্ধ এই বাপের প্রতি অনুকম্পার নিদর্শন স্বরূপ মালিকরা এই কিশোরকে সাবালক বানিয়ে মিলে কাজ দিয়েছে। সরকারী আইন হলো, আঠার বছরের নিম্ন বয়সের কেউ কারখানাতে কাজ করতে পারবে না। কারখানায় না হলেও নরেশকে তো এ বয়সে কোথাও কাজ করেই খেতে হবে। অন্য কোথাও কাজের চেয়ে বরং কারখানায় অনেক ভাল। তাই নরেশের বাবা মিলের মালিকদের অনেক অনুরোধ করে নরেশের কাজের ব্যবস্থা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানা হতে পড়ে নরেশ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। খুব জ্বর উঠেছে। এখনও সে বিপজ্জনকদের তালিকায়, অর্থাৎ তার জীবনাশঙ্কা আছে। তার উপর এই দুর্ঘটনা। ছোট্ট কচি ছেলে। চোখ বুজে চুপচাপ শুয়েছিল। আমি ওর মাথার ধারে বসে অনেকক্ষণ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ও মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার দিকে দেখছিল। মুখে কোন কথা নেই। আমিও বেশী কথা বলা অনুচিত মনে করলাম। শুধু একবার বলেছিলাম, এমন করলে কেন, ওতো আমাদের মজুর নয়। নরেশ অস্ফুটস্বরে বলল, আমাদের সাথে থাকে, সবাইতো মজুরই মনে করে, সে কথা ওকে কত বুঝিয়েছি।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালাম। নরেশের দিকে ফিরে চাইতে মনে হলো ও যেন কিছু বলতে চায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে? নরেশ হাত দিয়ে ইশারা করে ওর বিছানায় বসতে বলল। আমি বিছানার উপরে ওর মুখোমুখি বসলাম। নরেশ আমার একটা হাত ধরে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে থাকল। আমি বললাম, কি কথা বলতে চাও বল না, আমি তোমার কমরেড, আমাকে তো সব কথাই বলতে পার। নরেশ ধীরে ধীরে বলল, কমরেড, আমাদের লড়ায়ের খবর কমরেড ষ্ট্যালিন জানবেন কি?

আমি কতক্ষণ যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমার চোখ ছলছল করছিল। মৃত্যুপথযাত্রী এক কিশোর মজুর, মৃত্যুর পূর্বে তার কোন আক্ষেপ নেই, তার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই, শুধু এটুকু জানতে পারলেই সে সুখী যে, তারা যে সংগ্রাম করল সে খবর মজুরদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সোভিয়েত দেশে, তাদের যে ভায়েরা শ্রমিকরাজ কায়েম করেছে তাদের কানে পৌঁছুবে। নরেশদের এই সংগ্রাম যে বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামেরই একটা অংশ, শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাই যে তাদের এই সাহসিক লড়ায়ের প্রেরণা! সমাজতন্ত্র যারা গড়ে তুলেছে তারা যে নরেশের আপনার জন! তাদের এই সংগ্রামের খবর তার ভায়েরাই যদি না জানল তাহলে মৃত্যুর আগে নরেশের সান্ত্বনা কি, তৃপ্তি কোথায়! দুনিয়ার শ্রমিক এক হও– এই কিশোর শ্রমিকের কাছে এটা একটা শ্লোগান মাত্র নয় এ আন্তর্জাতিকতা, এটা তার কাছে বাস্তব সত্য, তার বিশ্বাসের অঙ্গ– এর উপরেই নির্ভর করছে তার শ্রেণীর ভবিষ্যত, সকল শোষিত মানুষের মুক্তি, তাদের সুখ-শান্তি-প্রগতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললাম, কমরেড স্ট্যালিন জানবেন বৈকি, অবশ্যই জানবেন। শুধু সোভিয়েত দেশের শ্রমিকরাই নন, সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী তোমাদের সংগ্রামের খবর জানবে। স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, নরেশের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শ্রেণীসংগ্রামের এক গর্বিত কিশোর সৈনিক, মৃত্যুশয্যায় তার কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দের খবর আর কি থাকতে পারে? এখন যদি সে মরেও, তার শ্রেণীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়েই মরবে। মৃত্যু ভয়ে সে ভীত নয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের আর একজন মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকের কথা উল্লেখ করে 'হাতে খড়ি' সমাপ্ত করব।

এক মাস পরের ঘটনা। সবগুলি মিলের মালিকরা একত্রে চেষ্টা করে লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের অভ্যন্তরে একটা বড় গুণ্ডাবাহিনী জমায়েত করেছে। দুপুর রাতে এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে সকল ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে, শ্রমিকদের ব্যারাকগুলি হতে সমস্ত শ্রমিকদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন শ্রমিক ব্যারাকগুলিতে স্থান নিয়েছে দেড়শ' দু'শ গুণ্ডা এবং তাদের রক্ষী হিসাবে ষোল জন সশস্ত্র পুলিশের একটা দল। কোম্পানীগুলি ও সরকার একত্রে যে পরিকল্পনা করেছে তা হলো এই : একদিন পরেই ভোর বেলা লক্ষ্মীনারায়ণ মিলে মিল চালু ভোঁ শুনে দূর দূরান্তের শ্রমিকরা এসে যখন দেখবে যে কারখানার ভেতরে অনেক লোক ঢুকে পড়েছে তখন সেই অনাহারক্লিষ্ট ধর্মঘটী শ্রমিকরা চাকরি হারাবার আশঙ্কায় ধর্মঘট ভেঙ্গে কারখানায় ঢুকে পড়বে। এই কৌশলে একটা মিলে ধর্মঘট ভাঙ্গতে পারলে অন্যান্য মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তখন সবগুলি মিলের শ্রমিকদের ধর্মঘটই ভেঙ্গে পড়বে। লক্ষ্মীনারায়ণ সব চেয়ে ছোট মিল, এখানে কম সংখ্যক মজুর দিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব। তাই মালিকরা এবং সরকার এই মিলেই প্রথম তাদের কৌশল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত করেছে। ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে পাহারারত একজন পুলিশ সন্ধ্যা রাতেই মিল ফটকে পাহারারত একজন ইউনিয়ন ভলান্টিয়ারকে এই ষড়যন্ত্রের খবর বলে দেয়। তাই ইউনিয়ন এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার প্রস্তুতির জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় পেল। রাতের মধ্যেই আশপাশের গ্রামের শ্রমিকদের সতর্ক করে দেয়া হয় এবং ভলান্টিয়ারদের সবাইকে প্রস্তুত রাখা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে ভোঁ পড়ল। গুণ্ডাবাহিনী যেয়ে কারখানায় ঢুকল। সশস্ত্র পুলিশ দলটি প্রস্তুত হয়ে শ্রমিক ব্যারাকের দোতলায় একটা ঘরে বসে থাকল। মাত্র একমাস আগে ২নং ঢাকেশ্বরী মিলে সৈন্যবাহিনীর সাথে মজুরদের সংঘর্ষের শিক্ষা হতে তারা হয়তো অবস্থাটা একটু বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল। চতুর্দিকের গ্রাম হতে দলে দলে শ্রমিক দৌড়ে এসে কারখানায় ঢুকল। কিন্তু কারখানা চালাবার জন্য নয়, গুণ্ডাদের তাড়াবার জন্য। লাঠিধারী চার পাঁচ শত ইউনিয়ন ভলান্টিয়ারের এক বাহিনীও এসে গেল। গুণ্ডাবাহিনীর সাথে হাতাহাতি সংঘর্ষ শুরু হলো। অবস্থা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে সশস্ত্র পুলিশের দলটি তাদের ঘরের খিল বন্ধ করে দিল। গুণ্ডাদের হাতে নানা ধরনের ধারাল লোহার অস্ত্র। কিন্তু যে নিরস্ত্র শ্রমিকদের নিকট রাইফেলের বুলেটকে হার মানতে হয়েছে গুণ্ডাদের লৌহাস্ত্র তাদের সাথে কতক্ষণ এঁটে উঠবে? তাড়া খেয়ে তারা পালাতে শুরু করল। অনেকে পুলিশের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তারা দরজা খুলল না। একজন একজন করে পিটিয়ে গুণ্ডাদের কারখানা হতে বের করে মিল সীমানা হতে তাড়িয়ে দেয়া হলো। মিল এখন ভলান্টিয়ারদের দখলে। কিছুক্ষণ পরে পুলিশবাহিনী দোতলা হতে ধীরে ধীরে নেমে এসে ভলান্টিয়ারদের বলল, আপনারা এখন মিল হতে চলে যান। আপনাদের গ্রেপ্তারের জন্য অনেক পুলিশ এসে যাবে এখনই।

গুণ্ডাদের সাথে সংঘর্ষে আমাদের ইউনিয়নের ভলান্টিয়ার ২নং ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিক হুরমত আলী মীর গুরুতর আহত হয়েছে। কোন কঠিন জিনিসের আঘাত তার কপালে লেগেছে। ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি দেখে আমাকে বললেন, অবিলম্বে ঢাকা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, বাঁচার আশা নাই বললেই বলে, উপরে কিছু দেখা যায় না সত্য, কিন্তু মাথার খুলির অনেকটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি একটা নৌকা ডেকে হুরমত আলীকে তাতে তোলা হলো।

হুরমত আলীর নিকট হতে বিদায় নিচ্ছি। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কমরেড, ডাক্তার আপনাকে কি বললেন, আমি মরব না? আমি বললাম, আপনি এসব কি বলছেন কমরেড, মরার কি হয়েছে, কয়েকদিন চিকিৎসা হলেই সেরে উঠবেন। মুহূর্তের মধ্যে হুরমত আলীর মুখ কালো হয়ে গেল। এতক্ষণ তাকে বেশ প্রফুল্লই মনে হয়েছে কিন্তু আমার জবাবের পরেই কেমন যেন বিমর্ষ বিবর্ণ মনে হলো তাকে। আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, আপনি বড় বিচলিত হচ্ছেন কমরেড, এটাতো মারাত্মক কিছু আঘাত নয়, ডাক্তার বললেন ভয়ের কিছুই নেই। হুরমত আলীর কানে আমার আশ্বাস বাণী পৌঁছুল কিনা বুঝলাম না। তাকে গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় আচ্ছন্ন মনে হলো। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেদনার সুরে বলল, কমরেড আমাদের এত বড় লড়াইয়ে একজন মুসলমানও মারা গেল না।

আমার চিন্তায় এ কথায় কোন জবাব জোগাল না। এ কি একটা সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রকাশ? এটা কি রকমের সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে যা নিজের সমাজকে গৌরবের আসনে বসাতে চায়? হিন্দু সমাজভুক্ত হোক কি মুসলমান সমাজভুক্ত হোক, মজুররা কেউ কারো পেছনে নয়, কেউ কারো চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, সবাই তারা একই জাতের মানুষ, একই ধাতুতে তারা গড়া– হুরমত আলী মীর তাঁর জীবন দিয়ে হয়তো এ সত্যটাই সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় হুরমত আলীর এই জীবনাহুতির আকাঙ্ক্ষার কথা আজও অনেক সময় মনে পড়ে। এর সুস্পষ্ট অর্থ আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। জীবন দিয়ে যারা নতুন জীবন গড়তে চায় সেই মহান বীরদের মনের গহীনের কত বিচিত্র ভাব, কত ভাষা, চিন্তা কাজ করে তা কি সব বুঝা যায়!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~